হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 4, Issue No. 11, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, August 2015

এই খণ্ডিত বঙ্গে এখন মুসলমানের সংখ্যা শতকরা পঁয়ত্রিশ। এই সংখ্যা একান্নতে পৌঁছলেই গান্ধীবাদ, মার্ক্সবাদ, ভজন, কীর্তন, মালা, টিকি, মহোৎসব, ভোগারতি সব শেষ হয়ে যাবে। 'সব ধর্ম সমান', 'খেটে খাওয়া মানুষের কোন জাত নেই', 'হিন্দু মুসলমান ঐক্য চাই'—এসব বলার জন্য তখন কেউ থাকবে না।

—শিবপ্রসাদ রায়

অবশেষে উদ্ধার মগরাহাটের টুকটুকি

দীর্ঘ আড়াই মাস ধরে মগরাহাটের লাভ জেহাদের শিকার নাবালিকা টুকটুকি মন্ডলকে উদ্ধার করার জন্য হিন্দু সংহতি যে কঠিন সংগ্রাম চালাচ্ছিল, তা আংশিক সফল হল। পুলিশ বাধ্য হল টুকটুকিকে উদ্ধার করতে ও কোর্টে তুলতে। তবে পুলিশের এক বড়কর্তা অনুজ শর্মা (আই.জি., ল অ্যান্ড অর্ডার) বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে, টুকটুকি নাকি নিজেই থানায় এসে উপস্থিত হয়েছে। এবং সে নাকি বিবৃতি দিয়েছে যে, সে নিজেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। একথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য। সে নিজে চলে গেলে এতদিন কোথায় ছিল, কার আশ্রয়ে ছিল, কেমন ছিল—সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব পুলিশের। মগরাহাট এলাকার সবাই জানে যে সেখানে পুলিশ সেলিমের নির্দেশ মতোই চলে। টুকটুকিকে উদ্ধারের জন্য আমেরিকার সাতটি শহরে বিক্ষোভ হয়েছে। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি ললিতা কুমারমঙ্গলম মগরাহাট এসেছেন। তিনি হিন্দু

হিন্দু সংহতি দপ্তরে জাতীয় মহিলা কমিশনের অধ্যক্ষা শ্রীমতি ললিতা কুমারমঙ্গলম এবং অন্য দুই সদস্যা।

সংহতির দপ্তরে টুকটুকির মা-বাবা ও ভাইবোনের সঙ্গে দেখা করে ঘটনার বিবরণ নিয়েছেন। এমনকি জাতীয় মহিলা কমিশন কলকাতা হাইকোর্টে টুকটুকির বাবা সুভাষ মন্ডলের দায়ের করা মামলায় পার্টিও হয়েছেন। তাই অন্য অনেক মেয়ের মত টুকটুকিকে ওরা হজম করতে পারলো না। সেলিমের সঙ্গে হিন্দু সংহতির পাঞ্জা লড়াইয়ে ওরা নতিস্বীকার করতে বাধ্য হলো এবং টুকটুকিকে কোর্টে তুলতে বাধ্য হল। ২১শে জুলাই তাকে ডায়মন্ডহারবার কোর্টে তোলা হলে টুকটুকি আদালতে বাড়ি না ফেরার আবেদন জানায়। সেইমতো তাকে একটি বেসরকারি হোমে পাঠানো নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

কিন্তু টুকটুকিকে পুলিশ হাজির করলেও তার মা-বাবার সঙ্গে তাকে একমিনিটও কথা বলতে দেয়নি। অর্থাৎ পুলিশ এখনও সেলিমের কথামতোই চলছে। নাবালিকা টুকটুকিকে কোর্টে তোলা হলে সে বাবা-মা'র কাছে ফিরে যেতে চায়নি। প্রশাসনের অভিযোগ, টুকটুকি নিজেই বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা বা কথা বলতে চায়নি। তাদের অত্যাচারে সে নিজে থেকেই চলে গিয়েছিল বলে আদালতকে জানিয়েছে। নাবালিকার বয়ানের ভিত্তিতে কোর্ট তাকে হোমে পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছে। মেয়ের বাবা-মাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তারা বলেন, আদরের মেয়ের প্রতি অত্যাচার তো দূরের কথা, তার গায়ে হাত পর্যন্ত কোনদিন তোলেননি। টুকটুকির মা-বাবার অভিযোগ যে, তাদের মেয়েকে প্রচণ্ড ভয় দেখানো হয়েছে তাই সে ওরকম কথা বলছে। পেশায় দিনমজুর সুভাষ মন্ডল জানান, অভাবের সংসারে মেয়েকে ভালো কিছু তারা দিতে পারেননি, কিন্তু কোর্টে তাদের প্রতি মেয়ের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

টুকটুকির ফিরে আসার রহস্য ও প্রশাসনের লুকোছুপি বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। যেমন—(ক) দীর্ঘ আটাত্তর দিন টুকটুকি কোথায় ছিল প্রশাসন তা জানাচ্ছে না কেন? (খ) এর আগেও টুকটুকি একবার বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। তখনও কি বাবার অত্যাচারে? তাহলে সেবার সে বাড়ি ফিরে এসেছিল কেন? (গ) বাড়ির অত্যাচারের কথা টুকটুকি পাড়া প্রতিবেশী বা অন্যান্য আত্মীয়কে জানায়নি কেন? (ঘ) সুভাষবাবুর বয়ান অনুযায়ী, গত ৪ঠা মে বাবুসোনা গাজি ও তার দলবল রাতের অন্ধকারে টুকটুকিকে বাড়ি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। এর সত্য-মিথ্যা পুলিশ যাচাই করলো না কেন? (ঙ) বাবুসোনার সঙ্গে যদি টুকটুকির ভালোবাসার সম্পর্ক, তাহলে স্কুলে যাওয়ার পথে সে টুকটুকিকে নিয়ে পালাতে পারত। জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ল কেন? (চ) টুকটুকি নাবালিকা। বাড়ি ছাড়ার পর তার বাবা-মা মগরাহাট থানায় অপহরণের কেস দায়ের করতে গেলে তা নেওয়া হল না কেন? দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে থাকা সত্ত্বেও পুলিশ নিজে থেকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করেছে কি? (ছ) ফিরে আসার পর প্রশাসন কেন টুকটুকির সঙ্গে তার মাকে একবারও দেখা করতে দিল না। কেন টুকটুকিকে প্রশাসন আড়াল করছে তার কোন জবাব নেই।

২১ তারিখ কোর্টে টুকটুকিকে এক ঝলক দেখে মনে হয়েছিল, যথেষ্ট চাপের মধ্যে আছে সে। একটা ভয়ের ছায়া তার মুখের মধ্যে ছিল। উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ, নতমুখ টুকটুকিকে দেখে কোর্টে তার মা কেঁদে ফেলেন। কিন্তু কোর্টে বিচারপতির সামনে তার বয়ান হতবাক করে দিয়েছে তার বাবা-মা সহ উপস্থিত সকলকে। কাঁদতে কাঁদতে টুকটুকির মা এই প্রতিবেদককে জানান, এ তার মেয়ের কথা হতেই পারে না। মেয়ের মুখ দিয়ে অন্য কেউ জোর করে এই কথা বলাচ্ছে।

ইসলামিক জেহাদীর আক্রমণে চাকুলিয়ার আদিবাসীরা সর্বস্বান্ত

আক্রান্ত পরিবারগুলিকে ত্রাণ বিলি করল হিন্দু সংহতির কর্মীরা।

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ইসলামিক জেহাদীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হল চাকুলিয়া। সেখানে ইতিমধ্যে ১০টি সাঁওতাল হিন্দু পরিবার মুসলমানের আক্রমণে সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসেছে। ঘটনাটি গত ২১শে জুলাই উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় ঘটেছে।

উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া থানার বেলন অঞ্চলের সিরসি গ্রামে নিরীহ আদিবাসী সাঁওতালদের দশটি হতদরিদ্র পরিবার ১৪ একর জমির উপর দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বসবাস করছেন। কিছুদিন যাবৎ কিছু বাংলাদেশী মুসলিম নানাভাবে উত্যক্ত করে তাঁদের সেখান থেকে বিতাড়নের চেষ্টা করতে থাকে বলে অভিযোগ। ২১শে জুলাই সকাল দশটা নাগাদ ঐ আদিবাসী পরিবারের সকল বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা যখন বাইরে মাঠে কাজ করতে যান তখন সাব্দুর আলি তার চার পুত্র শাকির, সাহাব, মুকিম এবং নাসেরের নেতৃত্বে প্রায় ১০০-১৫০ জন মুসলমান ওই আদিবাসী পাড়ায় চড়াও হয়। ১০টি পরিবারের বাড়িগুলি যথাসর্বস্ব লুট করে এবং আগুন দিয়ে বাড়িগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। বসতবাড়ির পর অবশিষ্ট জমিটুকুতে যে ধানচাষ করা হয়েছিল সেখানে ট্রাক্টর চালিয়ে ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে দরিদ্র নিরীহ আদিবাসী মানুষগুলোর ঠিকানা হল মাথার উপর খোলা আকাশ আর পায়ের তলায় নিজেরই বাড়ির পুড়ে যাওয়া ছাই।

ঘটনার পর পরই হিন্দু সংহতির কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। ততক্ষণে দুষ্কৃতিরা পালিয়েছে। অসহায় মানুষগুলোর মধ্যে ইতিমধ্যেই হিন্দু সংহতির কর্মীরা ত্রাণ বিলি করেছে। ঐ অঞ্চলের হিন্দু সংহতির কর্মী কাশীনাথ ঢালি, হারাধন ঢালি, ঝরু রায় ও গৌর দাঁড়িয়ে থেকে অসহায় মানুষগুলোর মধ্যে চিঁড়ে, চিনি, আলুসহ বিভিন্ন আনাজপাতি তাদের মধ্যে বিলি করে। স্থানীয় বিডিও সাহেব ইতিমধ্যে তাদের জন্য কিছু কালো পলিথিনের চাদর বন্দোবস্ত করেছেন। কার্তিক মুর্মু, প্রধান কিস্কু, কামু সোরেন, বালুই হাঁসদা, শুক্লা হাঁসদা, মঙ্গল হাঁসদা, মনিরম হাঁসদা, সরোজ সোরেন, চুনু সোরেন, ইজিয়ার কিস্কুর ভিটেমাটি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পুলিশ যদিও এই নিরীহ ও অতি দরিদ্র সাঁওতাল পরিবারগুলোকে মুসলমানের জেহাদি আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি, তবুও

শেষাংশ ২ পাতায়

১১ জুলাই পুণের লোকমান্য তিলক সভাগৃহে সাভারকর সাহস পুরস্কার গ্রহণ করছেন হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ। বিশদ সংবাদ ৫-এর পাতায়

আমাদের কথা

তোষণনীতি সর্বনাশ ডেকে আনবে পশ্চিমবঙ্গে

উদ্বেগটা আমরা অনেকদিন আগেই প্রকাশ করেছিলাম। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীও একইরকম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আর তা হল সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। সব কটি রাজনৈতিক দল এ ব্যাপারে একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তারা মনে করে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক নিজেদের পক্ষে টানতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গে ভোটে জিতে সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। তাই ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংখ্যালঘুদের মনরক্ষা করতে নেমে পড়েছে সবাই। ভোট রাজনীতিতে ওদের মন রক্ষা হলে নিজেদের মান রক্ষা হবে। এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যথেচ্ছ অন্যায় করছে, দুষ্কৃতিমূলক কাজ করছে, এমন কি দেশবিরোধী কাজেও তারা লিপ্ত হচ্ছে, কিন্তু সব দেশে শুনেও ধৃতরাষ্ট্র সেজে বসে আছে সবাই। দেশনীতির থেকে সংকীর্ণ রাজনীতি বড় হয়ে উঠেছে---তাই পশ্চিমবঙ্গের আকাশে আজ অশনি সংকেত।

ঠিক কী বলেছিলেন মাননীয় রাজ্যপাল? শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কলকাতার এক সভায় বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালরা উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী বলেন পশ্চিমবঙ্গের সব রাজনীতিক দল সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে। এর ফল হবে মারাত্মক। আগামী ১৫-২০ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ঘোরতর দুর্দিন আসছে। কিন্তু দুর্দিনটা কী তা তিনি পরিষ্কার করে বলেন নি। শুধু উপস্থিত সুধীজনকে এর অর্থ বুঝে নিতে বলেছেন। এইখানে মাননীয় রাজ্যপালের বক্তব্যের নিগূঢ় অর্থ কী ছিল তা আলোচনা করা যাক্।

সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির জোটবদ্ধ মুসলিম ভোটের দাসত্ব করার পরিণাম কী ভয়ঙ্কর হতে পারে তার প্রমাণ আমরা একবার পেয়েছি। ১৯৪৬ সালের রক্তাক্ত দাঙ্গার স্মৃতি এখনও বাঙালী ভুলতে পারেনি। কিন্তু ভোটলোভী রাজনৈতিক দলগুলো ইতিহাস বিকৃত করে বাঙালীর মন থেকে '৪৬-এর দাঙ্গায় হিন্দুর আর্তনাদে ভরা সেই রক্তাক্ত দিনগুলোর স্মৃতিকে ভুলিয়ে দিতে চায়। তার পরিণামে যে সেই দিনগুলোই আবার বাংলার গ্রামে গ্রামে ফিরে আসছে, এই ভয়ঙ্কর সত্যটিকেও চাপা দিতে চায় তারা। কিন্তু উস্তি-মল্লিকপুর-কালিগঞ্জ-হাঁসখালি-সমুদ্রগড়-পঞ্চগ্রামের ঘটনা প্রমাণ করছে সাম্প্রদায়িক শক্তি পশ্চিমবঙ্গে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মিডিয়া থেকে প্রশাসন, সকলেই বিষয়টিকে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চায়। যেন কিছুই হয়নি, প্রশাসনকে বদনাম করার জন্য হিন্দু সংগঠনগুলো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সবকিছুতে সাম্প্রদায়িক রং লাগাতে চায়। ভাইজানেরা সব দেশপ্রেমিক, দোষ সব ঐ হিন্দুগুলোর। মিথ্যে বলে বদনাম রটানো হিন্দুদের স্বভাব। রাজনৈতিক দলগুলো প্রতি মুহূর্তে জোর গলায় এই কথা প্রচার করছে, মিডিয়া হয়েছে ওদের দোসর। কিন্তু কেন এই অবিমৃশ্যকারিতা? এর উত্তর জানা নেই। কিংবা আছে। উত্তরটা হয়তো এইরকম—দেশ যায় যাক্, আমার গদি বাঁচুক। যতদিন আছি রাজার মতো থাকি। যারা আমায় রাজা বানালো, পুরস্কার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গটা তাদের দিয়ে যাব, এতে অন্যায়টা কোথায়। হায় রে আমার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিকরা, দেশদ্রোহিতার চূড়ান্ত নমুনা তোমাদের মধ্যে আজ দেখতে পাচ্ছি।

সুশীল সমাজও আশ্চর্য নীরবতা পালন করে ইসলামি আগ্রাসন নিয়ে। শহরের বিত্তশালী এলাকায় এদের বাস। প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জের খবর এরা রাখে না। বলা চলে রাখতে চায় না। গাজার খবর এঁদের কানে এসে পৌঁছায়, মায়ানমারের খবর এঁদের কানে এসে পৌঁছায়, শুধু পশ্চিমবাংলার গ্রামের অসহায় হিন্দু-নরনারীর আর্ত চিৎকার এঁদের কানে পৌঁছায় না, অদ্ভুতভাবে তাঁরা তখন বধির। হিন্দুর হয়ে কথা বলে নিজের ধর্মনিরপেক্ষতার তকমাটা তাঁরা খোয়াতে চান না। সাহিত্য, শিল্প, খেলাধূলার জগৎ থেকে শুরু করে সমস্ত সুশীল সমাজের মধ্যে এই বিকৃত সেক্যুলারিজমের রোগ। কিন্তু এই রোগের দাওয়াই নেই। দ্রুত দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা না করলে পশ্চিমবঙ্গের পতন অনিবার্য।

১ম পাতার শেষাংশ

ইসলামিক জেহাদীর আক্রমণে চাকুলিয়ার আদিবাসীরা সর্বস্বান্ত

প্রশাসন কিন্তু যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গেই কড়া হাতে এই নিন্দনীয় ঘটনাটির বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছেন। মিঃ শুভেন্দু মন্ডলের মত একজন ডি এস পি পদমর্যাদার পুলিশ অফিসারকে এই মামলাটির তদন্তকারী আধিকারিক হিসাবে নিয়োগের মাধ্যমে জেলা প্রশাসন যে বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন, তা পরিষ্কার। ইতিমধ্যে, তাঁরা দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করেছে (কেস নং ৩৮৬/১৫, ২১-৭-১৫)। দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে ১৪৩, ১৪৮, ১৪৯, ৪৪৭, ৪৮, ৪৩৬, ৪২৭, ৩৫৪, ৩৭৯ আইপিসি ধারায় কেস রুজু করা হয়েছে।

ঘটনার পর হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ মহাশয় চাকুলিয়া থানার ওসি-র সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে জানতে পারেন যে, আপাতত ১৩ জন মুসলমানের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, যার মধ্যে ৮ জনকে পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে। আশ্চর্যের বিষয় উক্ত ৮ জন বন্দির মধ্যে ৫ জনই মহিলা।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

রায়দিঘিতে জোর করে জমি দখল করে দোকান নির্মাণ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘি বাজারে সরকারি জমি দখল করে বেআইনি ১৫টি দোকান হওয়ায় অসুবিধায় পড়েছে স্থায়ী বৈধ দোকানদারেরা। এর ফলে বাজারে জল জমছে। অবৈধ দোকানের জন্য রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। গাড়ি নিয়ে চলাচলে রাস্তা পার হতে দুর্ভোগে পড়েছে কুলতলি নীমপীঠ কঙ্কনাদিঘি ব্রজবল্লভপুর সহ আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা। অবৈধ দোকানগুলি সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের। ফলতঃ প্রশাসন সব জেনেও অদ্ভুত নীরবতা পালন করছে। এই অঞ্চলে খাস জমি দখল করে এর আগেও সংখ্যালঘুরা দোকানঘর করেছে। বিভিন্ন সময়ে শুধুমাত্র হিন্দু সংহতির প্রতিনিধিরাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। রায়দিঘির সংহতি কর্মী ভগবতী হালদার খাস জমি দখলের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সংখ্যালঘুদের হাতে মারও খেয়েছেন। কিন্তু সেদিন অন্যরা শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। যদি সকলে সেদিন প্রতিবাদের পথে হেঁটে সংখ্যালঘুদের অন্যায়ভাবে খাস জমি দখল রুখে দিত, তাহলে আজকে রায়দিঘির বাজারে সরকারি জমি দখল করে বেআইনি দোকানঘর দুষ্কৃতিরা করতে পারতো না বলে এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন ভগবতী হালদার।

বর্তমানে মানুষের অসুবিধা করে গড়ে ওঠা বেআইনি দোকানগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য বাজার সমিতি সহ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকের সিদ্ধান্তও মানছে না বেআইনি দোকানদারেরা। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার (২রা জুলাই) বাজার সমিতি ও স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবরোধে সামিল হন। প্রশাসন শীঘ্র ব্যবস্থা না নিলে বনধের ডাক দেওয়া হবে বলে তারা জানায়। বৃহস্পতিবার কিছু দোকান বন্ধও ছিল। এ খবর জানিয়েছেন বাজার সমিতির পক্ষে বুদ্ধেশ্বর হালদার। পুলিশ পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। বেআইনি দোকানদারদের বক্তব্য, রমজান মাসের পর দোকান সরাবেন। তবে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডোমজুড় বাজারে লুটপাট চালালো সংখ্যালঘু মানুষেরা

হাওড়া জেলার ডোমজুড়ে পায়ে পা বাঁধিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা। তাদের আক্রমণে ডোমজুড় বাজারের হিন্দু দোকানগুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রায় দুই লক্ষ টাকার মতো মালপত্র লুটপাট ও বিনষ্ট হয়েছে। গত ২১শে জুলাই এমনই এক ঘটনার সাক্ষী রইল ডোমজুড়বাসী।

ঘটনার সূত্রপাত ডোমজুড় হাসপাতালের উল্টোদিকে অবস্থিত ''ইচ্ছে ডানা'' নামক একটি দোকানকে ঘিরে। মোবাইল, সিম কার্ড বিক্রি ও রিচার্জ প্রভৃতির দোকান ইচ্ছে ডানা। দোকানের মালিক দোকান থেকে বেরিয়ে যখন যাচ্ছিল তখন উল্টোদিক থেকে আসা দুইজন মুসলমানের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। বিনা প্ররোচনায় শেখ লালাবাবু গালাগাল দিলে উভয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়। মুহূর্তে বচসা মারামারির রূপ নেয়। আশপাশের লোকও মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ এসে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। এদের একজন হিন্দু ও দু'জন মুসলমান।

খবর পেয়ে মুসলমানেরা দলবেঁধে দু'জনকে ছাড়াতে ডোমজুড় থানায় যায়। সেখানে পুলিশের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের মধ্যে একজন মুসলিম থানার এসআইকে জামার কলার ধরে চড় মারে। তখন পুলিশ লাঠিচার্জ করলে বেশ কয়েকজন আহত হয়। আহতদের মধ্যে একজনকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। এই সময় হাসপাতালে ভর্তি করতে আসা মুসলমানেরা ঐ দোকানটি থেকে প্রায় দু লক্ষ টাকার মালপত্তর ও ক্যাশ লুট করে এবং মালপত্তর ফেলে দেয়। এর প্রতিবাদে হিন্দু দোকানদারেরা বুধবার (২২/৭) জোমজুড় বন্ধ করে ও রাস্তা অবরোধ করে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ডোমজুড়ে সর্বত্র বন্ধ পালিত হচ্ছে। ডোমজুড় ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি বরুণকুমার ঘোষের দাবী, দিনের আলোয় এলাকার একজন ব্যবসায়ী আক্রান্ত হয়েছে। তাই বাধ্য হয়েই বনধ ডেকেছি। আশপাশের দোকানদারেরা রাজনৈতিক রং ভুলে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে।

জমি দখল ঘিরে আক্রান্ত তৃণমূল নেত্রী

দীর্ঘদিন ধরে দখলে থাকা রেলের জমিতে ঘর তৈরি করতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যদের হাতেই আক্রান্ত হল দলেরই এক পঞ্চায়েত সদস্যা। ক্যানিং ১নং ব্লকের বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিপ্লবীনগরে ঘটনাটি ঘটে গত ১৭ই জুলাই, শুক্রবার। উল্লেখ এই অঞ্চলে রেলের জমি দখল করে বহু লোক বাস করে। অঞ্চলটি জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারি শরিফের অন্তর্গত।

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) সন্ধ্যায়। জনৈক অজিত দাস রেলের জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বাস করেন। তিনি পুরানো ঘরের বদলে নতুন ঘরের কাজ করছিলেন। সেই সময় সদলবলে চড়াও হয়ে ঘর তৈরিতে বাধা দিয়ে তৃণমূল পার্টি অফিস তৈরির কথা ঘোষণা করেন এলাকার তৃণমূল নেতা আনারুল সর্দার। অজিতের পরিবারের অভিযোগে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা উজ্জ্বলা সরকার ঘটনাস্থলে যান। আচমকা আনারুলের বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিবাদীদের উপর। উজ্জ্বলা সরকারকে হেনস্থা করে আনারুলের লোকেরা। অভিযোগ, অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে উজ্জ্বলা দেবীকে ধাক্কাও দেওয়া হয়। আক্রমণকারীদের আঘাতে গোপাল কর্মকারের মাথা ফাটে ও সোনাই দাস নামে এক মহিলার হাত ভাঙে। পিঙ্কি কর্মকার নামে এক গৃহবধূও আহত হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যুবক জানায়, তৃণমূলের পার্টি অফিসের নামে এলাকা দখলই আনারুলের লক্ষ্য। অঞ্চলটি সংখ্যালঘু প্রধান। তাই ত্রাস সঞ্চার করে এলাকা থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে জমি দখল করতেই এই আক্রমণ বলে এলাকাবাসীর অনেকে মনে করছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ এলেও স্বভাবতই কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

সিপিএম-গণতন্ত্র-জরুরী অবস্থা

তপন কুমার ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে আজ চলছে জঙ্গলের রাজত্ব। কলকাতা শহরের ট্রাফিক সিগন্যালের সঙ্গে মাইকে তারস্বরে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে। দিদি বড় ভালোবাসেন। কিন্তু সেই আওয়াজে চাপা পড়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার মানুষের আর্তনাদ। টুকটুকি মন্ডলদের মা-বাবার আর্তস্বর। সেদিকে মমতা ব্যানার্জী কান দিতে পারবেন না। তাঁকে সযত্নে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক রক্ষা করতে হবে। তাই উস্তি, কালিগঞ্জ, সমুদ্রগড়, পঞ্চগ্রামে হিন্দুদের বাড়িঘর দাউ দাউ করে জ্বলে গেলেও মমতার প্রশাসন হিন্দুদের প্রতি মমতাহীন। গোটা রাজ্যে সংখ্যালঘুর তাণ্ডবলীলা চলছে। দুর্বল দরিদ্র হিন্দুর পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই।

এসবের ফলে বহু এলাকাতেই হিন্দুদের মধ্যে মমতা ব্যানার্জী দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন। এ রাজ্যের বিজেপি আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবাদে কিছু আন্দোলন করার ভান করছে। কিন্তু সবাই জানে তা নিষ্ফলা। কারণ (১) বিজেপিতে কোন সাহসী লড়াকু নেতৃত্ব নেই, (২) বিজেপি-র সাংগঠনিক কাঠামো এখানে খুবই দুর্বল, (৩) কেন্দ্রে বহুচর্চিত মোদী-মমতা আঁতাত।

এই পরিস্থিতিতে ঘাপটি মেরে বসে আছে সিপিএম। মমতার জনপ্রিয়তা হারানোর সব লাভটাই তারা ফোকটে পেয়ে যাবে বলে আশা করছে। আর মুখে গণতন্ত্র বাঁচানোর কথা বলছে। তাদের ৩৪ বছরের শাসনে এ রাজ্যে তারা কতটা গণতন্ত্র রক্ষা করেছে তা এখনও কেউ ভোলেনি। কিন্তু আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ১৯৭৫-৭৭ সালে ভারতের গণতন্ত্রের সেই অন্ধকারময় দিনগুলিতে সিপিএমের ভূমিকার কথা। সেদিন ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থার নামে দেশে স্বৈরতন্ত্র চালু করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সেই স্বৈরতান্ত্রিক জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যখন জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজি দেশাই, বাজপেয়ী, আদবানী থেকে শুরু করে প্রফুল্ল সেন, সুশীল ধাড়া, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী থেকে শুরু করে বরুণ সেনগুপ্ত, গৌরকিশোর ঘোষ থেকে শুরু করে আমার মত কলেজ ছাত্রকে পর্যন্ত ইন্দিরা-সিদ্ধার্থরা জেলে ঢুকিয়েছিল, তখন সিপিএমের একজন নেতাকেও জেলে ঢোকানো হয় নি। সুরজিত, জ্যোতি বসু, বুদ্ধ ভট্টাচার্য্য, প্রমোদ দাশগুপ্ত, অনিল বিশ্বাস, বিমান বসু---একজনও সিপিএম নেতাকে ইন্দিরা-সিদ্ধার্থরা জেলে ঢোকাননি। কেন? আজকের অশিক্ষিত কমরেডরা জানে না। ওই তাবড় তাবড় বিপ্লবী নেতারা সেদিন ইন্দিরার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ইন্দিরা তাদেরকে বলেছিলেন, প্রতিদিন সকালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পা ধোয়া চরণামৃত পান করতে। জ্যোতিবাবু-প্রমোদ দাশগুপ্তরা তাই করতেন। তাই তাদেরকে জেলে ঢুকতে হয়নি। এরা দু'কান কাটা। তাই এখন এত বড় বড় কথা বলছে। গোটা পৃথিবী এই মাকুদেরকে জঞ্জালের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাদের সাধের রাশিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। সেখানকার মানুষ লেনিনের মূর্তিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। লেনিনগ্রাদের নাম পাল্টে পুরানো নাম সেন্ট পিটার্সবার্গ ফিরিয়ে এনেছে। রাশিয়া ও চীন দুদেশই মার্কসবাদকে কুলোর হাওয়া দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। চিন পুঁজিবাদী তত্ত্বের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু এখানকার ৩৪ বছর ধরে কামিয়ে খাওয়া অশিক্ষিত কমরেডরা এসব কথা জানে না বলে আলিমুদ্দিনের দোকান এখনো চলছে। আর বেশিদিন চলবে না। কমরেড, তোমাদের বিদায় হয়ে গিয়েছে। ৩৪ বছরে তোমরা শ্রমিক আমদানি করা রাজ্য থেকে শ্রমিক রপ্তানি করা রাজ্যে পরিণত করেছো। বাংলা আর তোমাদের গ্রহণ করবে না। তোমরা দেওয়ালের লিখন পড়তে পারছো না।

জরুরী অবস্থার সময় সিপিএম যখন রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ইন্দিরা গান্ধীর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে নিজেদের বিপ্লবী সত্তার আসল পরিচয় দিয়েছিল, তখন একজন ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি তৎকালীন ডায়মন্ড হারবারের সিপিএম এম.পি—জ্যোতির্ময় বসু। তিনি পার্টির নির্দেশ না মেনে জরুরী অবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন। আর সবাই পার্টির বাধ্য ছেলে। কেউ সেই জরুরী অবস্থার বিরোধিতা করেন নি। কেউ ইন্দিরা গান্ধীকে স্বৈরতান্ত্রিক বলেন নি। সিপিএম গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইতে যোগ দেয়নি। তারা জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনেও যোগ দেয়নি, নিজেরাও কোন আন্দোলন করেনি। তাই ইন্দিরা সেদিন সিপিএম-কে বিপজ্জনক বলে মনে করেন নি। সুতরাং সিপিএম নেতাদের গ্রেপ্তারও করেননি।

কয়েকজন বামপন্থী যুক্তি দিয়েছে—সিপিএম জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করলে তারপর জনগণ ১৯৭৭ সালে আবার ওই পার্টিকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনল কেন? প্রশ্নটা সঠিক। উত্তরটাও জানা দরকার।

১৯৭৭ সালে জানুয়ারি মাসে ইন্দিরা গান্ধী লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা করলে সিপিএম গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। আদি কংগ্রেস নেতা প্রফুল্ল সেনের হাত ধরে নির্বাচনী প্রচারে নামল। জনতা-পার্টির সঙ্গে পূর্ণ নির্বাচনী আঁতাত করল। তখন আমি আর এস এসের নবীন প্রচারক। সেই ঐতিহাসিক লোকসভা নির্বাচনে আর এস এসের নির্দেশে আমি তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে জনতা পার্টির প্রার্থী সুশীল ধাড়া-র হয়ে পাঁশকুড়া পূর্ব (কোলাঘাট) বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে প্রচারের কাজ করেছি। জরুরী অবস্থার জন্য জনগণ ছিল ক্ষিপ্ত। মার্চ মাসে নির্বাচনে কংগ্রেস হারলো। এমনকি অকল্পনীয়ভাবে ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর যুবরাজ পুত্র সঞ্জয় গান্ধীও হেরে গেলেন। ইন্দিরা হেরে যাওয়ার পর চরম দক্ষিণপন্থী নেতা মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রে জনতা সরকার গঠিত হল। মোরারজী বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসী সরকারগুলো ভেঙে দিলেন। পশ্চিমবঙ্গেও। জুন মাসে এখানে বিধানসভা নির্বাচন হল। লোকসভা নির্বাচনের আঁতাত বিধানসভা নির্বাচনে থাকল না। জনতা দলের প্রফুল্ল সেন সিপিএম-কে তাদের দাবিমত আসন দিতে রাজী হলেন না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে ত্রিমুখী লড়াই হল। কংগ্রেস, জনতা ও বামফ্রন্ট। জনতা পার্টি ছিল অগোছাল ও চরম বিশৃঙ্খল। কংগ্রেস পর্যুদস্ত। সিপিএম গোছানো অবস্থায়। তাই সেই নির্বাচনে সিপিএম জিতল।

এরজন্য সিপিএমের সাংগঠনিক দক্ষতার প্রশংসা করতেই হবে। বিশেষ করে সেই সময়ের অসম্ভব সংগঠন দক্ষ প্রমোদ দাশগুপ্ত-র অবদান বিরাট। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে যে, ১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মার খেয়ে সিপিএম কাপুরুষের মত গর্তে ঢুকে গিয়েছিল। তারপর রাশিয়ার মাধ্যমে ইন্দিরার কাছে নতিস্বীকার করে গুপ্ত আঁতাত করে নিজেদের চামড়া বাঁচিয়েছিল। তারপর সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ১৯৭৭ সালে নির্বাচনের আসরে। শেষ জয়---১৯৭৭ সালের জুন মাসে বিধানসভা নির্বাচনে এই বামেদেরই হয়েছিল। তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা, ঝড়ের সামনে মাথা নীচু করার বাস্তব বুদ্ধি এবং মেরুদণ্ডের নমনীয়তার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল।

পরের ইতিহাসটাও জানা দরকার। চরম দক্ষিণপন্থী মোরারজী দেশাই-এর সরকারের জন্য চরমভাবে বিঘ্নিত হল সোভিয়েত রাশিয়ার স্বার্থ। নেহেরু নিজেও ছিলেন বর্ণচোরা বামপন্থী, মাকু। তার উপর, নেতাজীকে গুপ্ত হত্যা করে রাশিয়া নেহেরুর গদিকে নিষ্কন্টক করে দিয়েছিল। আর তার বিনিময়ে কিনে নিয়েছিল নেহেরু ও নেহেরু পরিবারকে। তাই তো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পাক্কা কম্যুনিষ্ট কৃষ্ণমেনন, নুরুল হাসানকে স্থান দিয়েছিলেন নেহেরু। অন্যদিকে মার্কসবাদী অর্থনীতি অনুসরণ করে ছিবড়ে হয়ে যাওয়া রাশিয়া নেহেরুকে ব্ল্যাকমেল করে (নেতাজী হত্যার কথা বলে দেব, আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কথা বলে দেব) ভারতকে প্রচণ্ডভাবে আর্থিক শোষণ করে চলেছিল। যখন আন্তর্জাতিক বাজারে রুবলের মূল্য পঞ্চাশ পয়সা দাঁড়িয়েছে, তখন রাশিয়া ভারতের কাছে বিনিময় মূল্য নিত ১ রুবলের জন্য ৩০ টাকা। রাশিয়ার তখনকার অবস্থা জানতে হলে বিখ্যাত লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী-র লেখা ''দ্বন্দ্ব-মধুর'' বইটা পরে দেখুন।

১৯৭৭ সালে কংগ্রেস ও নেহেরু পরিবার ক্ষমতা থেকে চলে গেলে রাশিয়ার স্বার্থ চরমভাবে বিঘ্নিত হল। তাই রাশিয়া তার খেলা শুরু করে দিল। সাংবাদিকদের মধ্যে বামপন্থীদের প্রভাব ছিলই। তারা প্রচার শুরু করে দিল—জনতা পার্টি মানেই জনসংঘ, আর জনসংঘ মানেই আর এস এস। ফ্যাসিবাদী আর এস এস ভারতটাকে দখল করে নিল। এই ফ্যাসিবাদকে রুখতে হবে। তখন পাঁচমিশেলী জনতা দলে যেসব রাশিয়ার অর্থপুষ্ট সোস্যালিস্ট নেতারা ছিলেন তাদেরকে দিয়ে মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই জনতা সরকারকে ভেঙে দিল রাশিয়া। ৬ নম্বরী স্যোসালিস্ট নেতা পিলু মোদী রাশিয়া থেকে ঘুরে এসেই বায়না ধরলেন— জনসংঘের সব সদস্যকে আর এস এস থেকে পদত্যাগ করতে হবে। দ্বৈত সদস্যপদ চলবে না। বাজপেয়ী-আদবানী ইত্যাদি নেতারা মানলেন না। সেই অজুহাতে জনতা পার্টি ভেঙে দেওয়া হল। আর এস এস-কে রোখার অজুহাতে আবার রাশিয়ার তাঁবেদার নেহেরু পরিবারকে দিল্লীর ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা হল।

এই হল কাহিনী। এর মধ্যে অনেক উপ-কাহিনী আছে। সেগুলো সময় সুযোগ মত বলব। আজকের সিপিএমের অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত ক্যাডার- সমর্থকরা এসব ইতিহাস জানে না। তাদেরকে মূর্খ করে রাখাই সিপিএমের কৌশল। মূর্খ ক্যাডার-সমর্থকই সিপিএমের সম্পদ। সিপিএমের রাজত্ব মানে অজ্ঞতার প্রসার, অন্ধকারের বিস্তার। ৩৪ বছরের সেই অন্ধকার থেকে পশ্চিমবঙ্গ এখনো মুক্তি পায়নি। সেই অন্ধকারেরই ফসল বর্তমানের মমতা ব্যানার্জী।

মেমনের ফাঁসি রদের দাবি তুলল সিপিএম

মুম্বই হামলার মূল পাণ্ডা ইয়াকুব মেমনের ফাঁসি নিয়ে বিরোধিতায় নামল সিপিএম। তাদের বক্তব্য ইয়াকুব ষড়যন্ত্রে ছিল ঠিকই, তবে তাকে ফাঁসি দেওয়াটা অন্যায়। বরং ক্ষমা করা হোক ইয়াকুব মেমনকে।

কে এই ইয়াকুব মেমন? বাবরি মসজিদ পতনের পর ১৯৯৩ সালে মুম্বই-এ যে সিরিয়াল ব্লাস্ট ঘটিয়ে ছিল জঙ্গীরা, তার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী ইয়াকুব। সেদিনের ব্লাস্টে হতাহতের সংখ্যা ছিল প্রচুর, প্রায় ২৭৯ জন মানুষ মারা গিয়েছিল, আহত ৭৫০ জন। পুরো মুম্বই নগরীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। এ হেন জঘন্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীকে আদালত মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছিল। ইয়াকুব উচ্চ আদালতে আপীল করে। কিন্তু তার অপরাধের নৃশংসতা দেখে শীর্ষ আদালতও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বহাল রাখেন। এমন কি রাষ্ট্রপতিও তাকে ক্ষমা করতে রাজি হননি। এখন ইয়াকুব মেমনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

কিন্তু এরই মধ্যে এদেশের কমিউনিস্টরা ক্ষমাশীল হয়ে উঠলো। তারা শুধু ইয়াকুবকে ক্ষমা করার কথাই বলেনি, তাকে ফাঁসি দেওয়াটা অন্যায় হবে বলেও দাবী করেন। কিন্তু কেন হঠাৎ ইয়াকুব-এর প্রতি এতটা দরদী হয়ে উঠলো কমিউনিস্টরা। বছর দশেক আগে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট জমানাতে ধনঞ্জয়কে দীর্ঘ কারাবাসের পরও ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। ধর্ষকের ফাঁসি চেয়ে সেদিন পথে নেমেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের জায়া মীরা ভট্টাচার্য্য। ধনঞ্জয়ের অপরাধও ছিল ক্ষমার অযোগ্য, তাহলে ইয়াকুব- এর বেলায় উল্টোপুরাণ কেন? আসলে ব্যাপার দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। মুসলিম সমাজকে তোষণ করতেই তারা ইয়াকুব মেমনের ফাঁসি রদের দাবী তুলেছে। এ চরিত্র তাদের নতুন নয়। ৩৪ বছরের রাজত্বে মুসলিম তোষণ করে সিপিএম ও তার সহযোগী দলগুলি পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ করে গেছে। এখন ক্ষমতা গেছে, কিন্তু স্বভাবটা বদলায় নি। এদের দেশদ্রোহী মানসিকতা ভারতের বুকে চরম দুর্দিন ডেকে আনবে। তাই ব্রাত্য কমিউনিস্টদের আজ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার সময় এসেছে।

কোচবিহারে রাজবংশী নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা

কোচবিহার জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ব্লক শিতলকুচি থানার অন্তর্গত রাঙামাটি গ্রামের ঘটনা। গত ৫ই জুলাই ওই গ্রামের বাসিন্দা আনারুল খন্দকার, পিতা-খবিরুদ্দিন্ন খন্দকার রাজবংশী নাবালিকা মানসী বর্মন (নাম পরিবর্তিত, ১১ বছর, পিতা-মনিশংকর বর্মন)-কে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

মানসীর মায়ের বয়ান অনুযায়ী তার মেয়ে পাড়ার আরও কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে পাশের বাড়িতে টিভি দেখতে যায়। অন্যান্য মেয়েরা বাড়ি চলে গেলেও মানসী তখন টিভি দেখছিল। ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে আনারুল বাড়িতে ঢুকে তাকে জাপটে ধরে এবং মুখে কাপড় গুঁজে পিছনে এক ফাঁকা জায়গাতে নিয়ে যায়। মেয়েটি প্রতিরোধ করলে দুষ্কৃতি আনারুল তার গালে কামড়ে দেয়। জোর করে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এই সময় মেয়েটির চিৎকারে পড়শি ও মেয়েটির মা ঘটনাস্থলে এসে অপরাধীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে সব কথা খুলে বললে উপস্থিত সকলে আনারুলকে চড়থাপ্পড় মারে। বেগতিক দেখে আনারুল পালিয়ে যায়।

মানসীর মা সাবিত্রীদেবী মেয়েকে নিয়ে বাড়ি এসে তার চিকিৎসা করান। এরপর উক্ত ঘটনার কথা তিনি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পঞ্চায়েতকে জানিয়ে তাদের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করেন। পঞ্চায়েত আনারুল ও তার পরিবারকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠায়। কিন্তু আনারুলের পরিবারের সদস্যরা পঞ্চায়েতের বিচার মানতে চায়নি। উপরন্তু সাবিত্রীদেবী ও তার মেয়েকে প্রাণে মারার হুমকি দেয়। পঞ্চায়েতের সুবিচার না পেয়ে সাবিত্রীদেবী স্থানীয় শিতলকুচি থানায় অভিযোগ জানান। কিন্তু প্রাথমিকভাবে থানা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে রাজি হয়নি। তখন রাজবংশী সম্প্রদায়ের ১৫০-২০০ মানুষ এলাকায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। বাধ্য হয়ে থানা আনারুলের নামে একটি এফ আই আর দায়ের করে (১৯৯/১৫)। আসামীর বিরুদ্ধে ৭৬(২), ৫১১ ও ৩০৬ আই পি সি ধারায় কেস দায়ের করা হয়েছে। যদিও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আসামী আনারুলকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। স্থানীয় মানুষদের ধারণা আনারুল নিকটবর্তী সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছে।

হিন্দু সংহতি-র আহ্বানে বাঙালীর রক্ষাকর্তা শ্রী গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে পদযাত্রা

যে জাতি রক্ষককে ভুলে যায় আর ভক্ষককে পূজা করে সে জাতিকে বাঁচাবে কে? ১৯৪৬ সালের সেই ভয়ঙ্কর দিনটাতে কলকাতা শহরে হিন্দুদের রক্ষক ছিলেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আর ভক্ষক ছিলেন হোসেন সাহিদ সুরাবর্দী। গোলাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কোন নেতা ছিলেন না, রাজনীতি করতেন না। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ব্যক্তি। আর সুরাবর্দী ছিলেন মুসলিম লীগের নেতা ও অখণ্ড বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। দিনটা ছিল ১৬ই আগস্ট। ১৯৪৬ সালের এই দিনটাকে মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস (Direct Action Day) হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, ভারতকে ভাগ করে পাকিস্তান আদায়ের দাবীতে। দাবীটা সকলে বুঝেছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামটা কার বিরুদ্ধে---সেটা হিন্দুরা বোঝেনি, এমনই বুদ্ধিমান ছিলেন আমাদের বাপ ঠাকুর্দারা। আর সংগ্রামটা কিরকম তাও বোঝেননি আমাদের পূর্বপুরুষেরা। তাঁরা মনে করেছিলেন—এটা বুঝি গান্ধী বা আন্না হাজারের মত ঝাণ্ডা নেড়ে অনশন করার মত সংগ্রাম। তাই ১৬ই আগস্ট সকাল থেকে যখন মুসলিম লীগের পোষা গুণ্ডারা কলকাতার কয়েকটি পাড়ায় আক্রমণ করা শুরু করে দিল, তখনও হিন্দুদের চোখ খোলেনি। তাই বিকালে কলকাতার প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুরা মনুমেন্ট ময়দানে গিয়েছিল মুসলিম লীগ ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির যৌথ মিটিং শুনতে। সেই মিটিংয়ে একসঙ্গে বাঁধা হয়েছিল চাঁদতারা মার্কা সবুজ পতাকা ও কম্যুনিস্টদের লাল পতাকা। মঞ্চ আলো করে একসঙ্গে বসেছিলেন কমরেড জ্যোতি বসু, হোসেন সুরাবর্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিন। সেই মিটিংয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জ্যোতি বসু শ্লোগান দিলেন—'আগে পাকিস্তান দিতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে।'

বিকালবেলায় এই মিটিং শেষে ফেরবার পথেই মুসলমানরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ধর্মতলায় হিন্দুদের উপর ও হিন্দু দোকানগুলির উপর। ১৯৪৬-এর ১৬, ১৭, ১৮ আগস্ট গোটা কলকাতায় তিনদিন ধরে যে হত্যালীলা চলল আধুনিক ইতিহাসে সে নৃশংসতা বিরল। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ও নিরীহ হিন্দুরা মুসলিম লীগ গুণ্ডাদের হাতে কচুকাটা হতে লাগল। কলকাতার রাস্তা হিন্দুর রক্তে লাল হয়ে গেল। সর্বত্র মানুষের লাশ পড়ে। স্তব্ধ হয়ে গেল জনজীবন। এই তিনটে দিনকে বর্ণনা করার মত ভাষা মানুষের কাছে ছিল না। ইংরাজি স্টেটস্ম্যান পত্রিকা এই ঘটনার হেডিং করেছিল "The Great Calcutta Killing"। অন্য সাংবাদিকরা লিখেছিলেন—"Week of Long Knives"।

ওই সময় একজন বিদেশী সাংবাদিক কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নাম ফিলিপ ট্যালবট। তিনি হিন্দু বা মুসলমান কোন পক্ষভুক্ত না হওয়ায় তাঁর বর্ণনাকে গবেষকরা নিরপেক্ষ ও সঠিক বলে মনে করেন। এই সাংবাদিক 'Institute of Current World Affairs' সংস্থার প্রধান ওয়াল্টার রজার্সকে চিঠিতে লিখেছেন—ভারতের বৃহত্তম শহর ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরটা যেন নিজেকে নরখাদকে পরিণত করার কাজে লিপ্ত হয়েছে। শহরের সমস্ত রাস্তায় দোকানগুলির একটিরও দেওয়াল বা দরজা গোটা নেই। সমস্ত দোকান লুট হয়েছে। আর গুণ্ডারা যেগুলো লুট করতে পারেনি, সেগুলো রাস্তায় ছড়ানো। আর ছড়ানো চারিদিকে মানুষের লাশ। টাটকা লাশ, গরমে পচে যাওয়া লাশ, অঙ্গহীন লাশ, থেঁতলে যাওয়া লাশ, ঠেলাগাড়িতে স্তূপাকৃতি লাশ, নর্দমায় লাশ, খালি জায়গায় স্তূপ হয়ে থাকা লাশ, শুধু লাশ আর লাশ।

ফিলিপ ট্যালবট আরও লিখেছেন---শুধু ৩৫০০ লাশ সংগ্রহ করে গোনা হয়েছে, আর কত লাশ যে হুগলি নদী দিয়ে ভেসে গিয়েছে, কত লাশ হাইড্রেনে আটকা পড়ে আছে, কত লাশ যে ১২০০ স্থানে দাঙ্গার আগুনে পুড়ে গিয়েছে, আর কত লাশ মৃতের আত্মীয়রা তুলে নিয়ে গিয়ে সৎকার করে দিয়েছে—তার সংখ্যা কেউ বলতে পারবে না। তিনদিন পর শহরে সেনা নামানো হয়েছিল। সেনাবাহিনীর অনুমান—৭০০০ থেকে ১০,০০০ লোক এই দাঙ্গায় নিহত হয়েছে।

এই বীভৎস নরসংহারের প্রত্যক্ষ নায়ক ছিলেন মুসলিম লীগের সুরাবর্দী। এই নরঘাতক মুখ্যমন্ত্রী সেদিন কলকাতার জনসভায় ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তান দাবী আদায়ের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হবে। অর্থাৎ তিনি মুসলিম গুণ্ডাদেরকে প্রত্যক্ষ উস্কানি দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ঐ নরঘাতক সেদিন লালবাজারে পুলিশ সদর দপ্তরের কন্ট্রোল রুমে বসে থেকে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে হিন্দুদেরকে কচুকাটা করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। নিউ মার্কেট এলাকার বোম্বাইয়া, কর্ণওয়ালিশ বস্তির মিনা পাঞ্জাবি ও হ্যারিসন রোডের মুন্না চৌধুরী—এই তিনজন কুখ্যাত গুণ্ডা আগে থেকেই মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এরা হিন্দু নিধনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল।

আঘাতের সেই প্রচণ্ড ধাক্কায় হিন্দুরা যেন অবশ হয়ে পড়েছিল। প্রতিকার ও প্রতিক্রিয়া তো দূরের কথা, আত্মরক্ষাটুকু করতেও তারা অসমর্থ ছিল। নেহেরু তখন দিল্লীতে অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী। তিনি ও তাঁর গুরু গান্ধীজী কলকাতার এই হত্যালীলার সময় নপুংসকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাই হিন্দুরা মনে করেছিল যে এটাই তাদের নিয়তি।

বাংলার ও কলকাতার হিন্দুর সেই অবশ ও বিবশ অবস্থায় তিনদিন পর সামান্য সাড়া ফিরিয়ে এনেছিলেন যে অল্প কয়েকজন অসমসাহসিক ব্যক্তি, তাঁদের মধ্যে প্রথম ও অন্যতম ছিলেন শ্রী গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মধ্য কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে মলঙ্গা লেনে তাঁর বাড়ি। বৌবাজারেই তাঁর একটি পাঁঠার মাংসের দোকান ছিল বলে তিনি 'গোপাল পাঁঠা' নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র মুখার্জী তাঁর নিকট আত্মীয় ছিলেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শে বিশ্বাস করতেন। ফলে গান্ধীর অহিংসা নীতিতে তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইংরেজকে বলপ্রয়োগ করেই ভারত থেকে তাড়াতে হবে। কিন্তু কংগ্রেসের কিছু নেতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিশেষ করে তাঁর প্রতিবেশী কংগ্রেস নেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল।

গোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর মতাদর্শ অনুসারেই 'ভারত জাতীয় বাহিনী' নামে একটি ছোট সংগঠন পরিচালনা করতেন। বিপ্লবী চিন্তাধারা অনুযায়ী সেখানে শক্তি ও অস্ত্রের চর্চা হত। এই সংগঠনটি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ বেশি অবহিত ছিল না। কিন্তু ১৯৪৬-এর আগস্ট গণহত্যার সময় গোপাল পাঁঠার নেতৃত্বে 'ভারত জাতীয় বাহিনী' কলকাতায় হিন্দু প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। সেদিন হিন্দুরক্ষায় ও মুসলিম দুষ্কৃতি দমনে অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল গোপাল মুখোপাধ্যায়ের অনুগামীরা। সেদিন কলকাতার হিন্দুদের চোখে তিনি পরিত্রাতা রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

এছাড়া সেদিনের সেই গৃহযুদ্ধে হিন্দুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন শ্রী যুগলকিশোর ঘোষ। কলকাতা শহরের শিখ এবং গোয়ালারাও এই কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।

হিন্দুরা প্রথমে মার খেয়ে যখন পাল্টা মার দিতে শুরু করল, তখন হিন্দুঘাতক সুরাবর্দী ইংরেজ সরকারকে অনুরোধ করে সেনাবাহিনী নামালেন। কয়েকদিনের মধ্যেই মুসলিম লীগ বুঝতে পারল যে তাদের ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। তখন মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠনের প্রধান জি.জি. আজমীরী ও মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য শেখ মুজিবর রহমান (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে করজোড়ে অনুরোধ জানালেন এই রক্তপাত বন্ধ করার জন্য।

তারপর হল নোয়াখালি। ১৯৪৬-এর ১০ই অক্টোবর কোজাগরী পূর্ণিমার দিন থেকে পূর্ববঙ্গের দুর্গম জেলা নোয়াখালিতে আর এক সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ নেতা গোলাম সারোয়ারের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল হিন্দু নিধন। ইতিহাসের আর এক কালো অধ্যায়।

এল '৪৭। ১৪ই আগস্ট দেশ ভাগ হবে, আগে পাকিস্তান জন্ম নেবে। তারপর ১৫ই আগস্ট ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। মোহনদাস গান্ধী ঠিক করেছিলেন—ওইদিন তিনি দিল্লীতে থাকবেন না। নোয়াখালিতে গিয়ে নিপীড়িত হিন্দুর পাশে থাকবেন। সেই উদ্দেশ্যে ৯ই আগস্ট তিনি কলকাতায় এলেন। কিন্তু এখানে সুরাবর্দী ও মুসলমানরা তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ করল তাদেরকে বাঁচাতে। কারণ, দেশভাগের ফলে পুলিশ

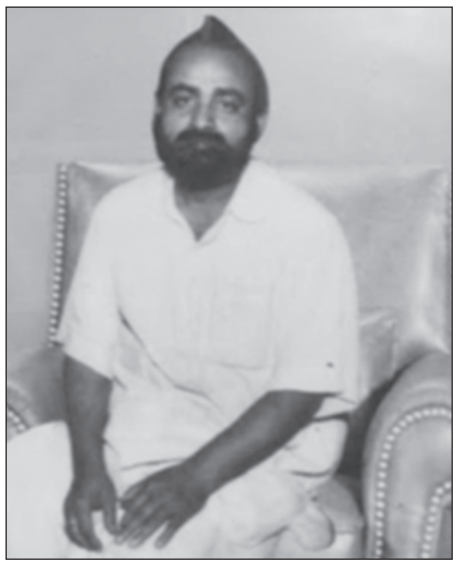

বাহিনীর মুসলিম পুলিশরা পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। ফলে এখানে তারা নিরাপদ নয়। তাদের এই আবেদন শুনে গান্ধী নোয়াখালির হিন্দুদের কথা ভুলে গিয়ে কলকাতাতেই থেকে গেলেন মুসলিম রক্ষার জন্য। হিন্দুরা তাঁকে ব্যঙ্গ করতে লাগল। কিন্তু তিনি অবিচলিত থেকে হিন্দুদের কাছে আবেদন জানালেন মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ত্যাগ করতে এবং সমস্ত অস্ত্র তাঁর কাছে জমা করতে। গান্ধীজী দু'বার ব্যক্তিগতভাবে গোপাল মুখোপাধ্যায়কে আবেদন করলেন অস্ত্র জমা দিতে। গোপালবাবু তাতে কর্ণপাত করেন নি। তখন গান্ধীজীর সচিব গোপালবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি অস্ত্র জমা দিচ্ছেন না? গোপালবাবু তাঁকে দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"যে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আমি দাঙ্গার সময় হিন্দু মা-বোনেদের সম্মান রক্ষা করেছি, সেগুলো জমা দেওয়া তো দূরের কথা, একটা ছুঁচ পর্যন্ত আমি জমা দেবো না।"

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৩। মৃত্যু ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৫।

এই কিছুদিন আগে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মণি কলকাতা এসেছিলেন। এখানে এসে তিনি মেদিনীপুর শহরে গেলেন ৪৬-এর হিন্দুঘাতক সুরাবর্দীর বাড়ি দেখতে। ওখানেই সুরাবর্দীর জন্ম হয়েছিল। অর্থাৎ ভারত বিভাজনকারী হিন্দু গণহত্যাকারী হোসেন সুরাবর্দীর বাড়ি আমরা এখনও যত্ন করে রক্ষণাবেক্ষণ করছি। কিন্তু ১৯৪৬-৪৭-এ হিন্দুর পরিত্রাতা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আমরা ভুলে গিয়েছি। ইতিহাসকে যারা ভোলে, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করে না।

সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি জোটবদ্ধ মুসলিম ব্লক ভোটের দাসত্ব করতে ১৯৪৬-৪৭ এর হিন্দুর আর্তনাদ ভরা সেই রক্তাক্ত দিনগুলি মানুষকে ভুলিয়ে দিতে চায়। তার পরিণামে যে সেই দিনগুলোই আবার বাংলার গ্রামে গ্রামে ফিরে আসছে—এই ভয়ঙ্কর সত্যটিকেও চাপা দিতে চায় তারা। কিন্তু তা আর চাপা থাকছে না। উস্তি-মল্লিকপুর-কালিগঞ্জ-হাঁসখালি-সমুদ্রগড়-পঞ্চগ্রামের ঘটনা আবার বাংলার আকাশে অশনি সংকেত। এই অবস্থায় 'হিন্দু সংহতি'র পক্ষ থেকে ১৯৪৬-৪৭-এর সেই ইতিহাসকে মানুষের সামনে তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস আমরা করছি ১৬ই আগস্টকে সামনে রেখে। গত তিনবছর আমাদের এই অনুষ্ঠান দেশে বিদেশে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। এ বছর ১৬ই আগস্টের কর্মসূচী আমরা আরও বড় আকারে নিয়েছি।

ভারতে আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিচ্ছে আইসিস

আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অংশ হিসাবে ভারতকেই আগে নিশানা করছে আইসিস। এর নেপথ্যে রয়েছে আমেরিকার বিরুদ্ধে সব জঙ্গি গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। ভারতে আক্রমণ করার মাধ্যমে সেই পরিকল্পনা সফলভাবে প্রয়োগ করতে চায় আইসিস (ISIS)। এই কাজে সহায়তা পাওয়ার জন্য তারা পাকিস্তানের ও আফগানিস্তানের তালিবানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এ বিষয়ে সফল হওয়ার জন্য তারা একটি যৌথ ফ্রন্ট গড়ে তোলারও পরিকল্পনা নিয়েছে।

ইউএসএ টুডে পত্রিকায় একটি তদন্তমূলক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী সম্প্রতি এক পাকিস্তানি নাগরিকের কাছ থেকে একটি উর্দুতে লেখা ৩২ পাথার নথি উদ্ধার করেছে আমেরিকার গোয়েন্দারা। এই পাক নাগরিকের সঙ্গে তালিবানের যোগাযোগ রয়েছে। রিপোর্টে লেখা হয়েছে, ভারতে হামলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে, এই হামলা আসলে আমেরিকার বিরুদ্ধে আরও বড় যুদ্ধ ঘোষণার 'ড্রেস-রিহার্সাল' হিসাবে দেখছে আইসিস জঙ্গিরা।

পাক নাগরিকের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া নথিতে জানা যাচ্ছে, আইসিস নেতৃত্বের ধারণা, আমেরিকা সব মিত্রশক্তিকে একত্র করে তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করলে বিশ্বের ১০০ কোটি মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে লড়বে। উর্দুতে লেখা এই নথিটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন হার্ভার্ডের এক স্কলার। প্রাক্তন সিআইএ অফিসার ব্রুস রিডেল জানিয়েছেন, ভারতে আক্রমণ করতে পারলে আইসিসের মর্যাদা বেড়ে যাবে জঙ্গি মহলে। এর ফলে উপমহাদেশেও অস্থিরতা সৃষ্টি করা যাবে।

উর্দু নথিটিতে কোনও তারিখ না থাকলেও জানা যাচ্ছে, তার উপর শিরোনাম হিসাবে লেখা রয়েছে, 'ইসলামিক খলিফার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'। মার্কিন গোয়েন্দা এজেন্সির মত অনুযায়ী এই আক্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীকেও একটি ছাতার তলায় আনার চেষ্টা করছে আইসিস।

(সৌজন্যে ঃ বর্তমান পত্রিকা)

নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি হল হিন্দু সংহতি-র

২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটি শেষ পুনর্গঠন করা হয়েছিল। গত তিন বছর ধরে এই কমিটি হিন্দু সংহতির কাজ দেখাশোনা করছিল। সংগঠনের সংবিধান অনুযায়ী তিন বছর পর নতুন কমিটি গঠন করা আবশ্যক। সেই রীতি অনুযায়ী হিন্দু সংহতির নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। গত মাসিক বৈঠকে এই কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বিশেষ রদবদল না হলেও কমিটিতে বেশ কিছু নতুন মুখ সংযোজিত হয়। সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ-ই রয়েছেন। রাজ্য সম্পাদক শ্রী সমীর গুহরায়-এর জায়গায় শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য্যকে নিয়োগ করা হয়। সমীর গুহ রায়কে সহ সভাপতি পদে মনোনীত করা হয়েছে। অন্য দুজন সহ সভাপতি হলেন আইনজীবী শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রী দেবদত্ত মাজি। কোষাধ্যক্ষ শ্রী সুজিত মাইতি, সহ সম্পাদক শ্রী সুন্দর গোপাল দাস ও শ্রী মুকুন্দ কোলে। কার্যালয় প্রমুখ সাগর হালদার।

একটি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করা হয়েছে। তাতে পূজ্যস্বামী প্রদীপ্তানন্দজী, শ্রী চিত্তরঞ্জন দে, শ্রী প্রসূন মৈত্র এবং শ্রী জয়দীপ মিত্র রয়েছেন।

নব নির্বাচিত কমিটিতে সদস্য হিসাবে রয়েছেন রাজকুমার সরদার, ঋদ্ধিমান আর্য, সৌরভ শাসমল, দীপক সান্যাল ও সুষেণ বিশ্বাস। এবারই প্রথম মহিলাদের রাজ্য কমিটিতে আনা হয়েছে। হিন্দু সংহতির মহিলা সংগঠনের কাজের ভিত্তিতে অর্পিতা মৈত্র, ভগবতী হালদার ও স্নেহা নস্করকে রাজ্য কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। ১লা জুলাই থেকে এই কমিটি কার্যভার গ্রহণ করেছে।

জন অধিকার মঞ্চ-কে পথসভা করতে দিল না প্রশাসন

গত ১০ই জুলাই টুকটুকি মণ্ডলের অপহরণ ও প্রশাসনের তাকে উদ্ধার করার ব্যর্থতার প্রতিবাদে ‘জন অধিকার মঞ্চ’ থেকে একটি প্রতিবাদী পথসভার আয়োজন করা হয় কলকাতার হাজরা মোড়ে। সময় ছিল সন্ধ্যা ছ’টা। ফেসবুক মারফত সেই খবর দু’সপ্তাহ আগে থেকেই প্রচার করা হয়। ফলে শুক্রবার শহরের বিভিন্ন প্রান্ত ও গ্রামাঞ্চল থেকে শ’তিনের মানুষ পথসভায় যোগ দিতে আসেন। জন অধিকার মঞ্চের প্রতিনিধি স্থানীয় নেতৃত্ব প্রসূন মৈত্র, দেবদত্ত মাজি, রাজা দেবনাথ, সুজিত মাইতি, সুমন্ত মাইতিরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন বিশাল পুলিশ বাহিনী দিয়ে সভামঞ্চকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে জন অধিকার মঞ্চকে তাদের পথসভা বাতিল করতে হবে। কিন্তু প্রশাসন এর কোন সুনির্দিষ্ট কারণ দেখাতে পারেনি। এই সময়ে প্রসূন মৈত্র, দেবদত্ত মাজি, সুজিত মাইতিরা পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে সুষেণ বিশ্বাস সভামঞ্চ থেকে স্লোগান দিলে ১৩ জন কর্মী সমর্থককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের লালবাজারে আনা হয়। দীর্ঘক্ষণ আটক রাখার পর সেই রাতেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় জন অধিকার মঞ্চের অন্যতম কর্ণধার দেবতনু ভট্টাচার্য তাঁর ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেন নি। বিশেষ কর্মসূত্রে তিনি তখন পুনায় ছিলেন। ফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সংখ্যালঘুরা পার্ক স্ট্রীট অচল করে দেয়, পুলিশ-প্রশাসন চুপ রইল, আর আমাদের ঘরের মেয়ে টুকটুকি আজ দু’মাস দুষ্কৃতিদের ডেরায় যন্ত্রণার জীবন কাটাচ্ছে। তার প্রতিবাদে পথসভাকে বানচালের জন্য পুলিশী তৎপরতা দেখার মতো।’

পরদিন পুলিশ থেকে প্রসূন মৈত্রকে জানানো হয় গ্রেপ্তার হওয়া ১৩ জনের নামে একটি কেস দায়ের করা হয়েছে। সোমবার (১৩/৭) গ্রেপ্তার হওয়া কর্মীরা আলিপুর আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পায়।

জয়নগরে জমি দখলে বাধা দেওয়ায় হিন্দু দম্পতিকে মার

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ল্যান্ডজেহাদের চক্রান্ত অব্যাহত। এই ল্যান্ড জেহাদের মাধ্যমেই বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের ভিটেছাড়া তথা এলাকা ছাড়া করার চক্রান্ত চলছে। এবারের ঘটনা জয়নগর থানার বাগবেড়িয়ার (বুড়োর ঘাট)। সেখানে জমি দখলে বাধা দেওয়ায় এক চায়ের দোকানদার এবং তাঁর স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করা হয়। গুরুতর আহত ওই মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জয়নগর থানা এলাকার বাগবেড়িয়ায় জামতলা রোডের পাশে পি ডব্লু ডি-র জমিতে এলাকার বাসিন্দা সুদাম দেবনাথের একটি চায়ের দোকান রয়েছে। প্রায় ৩৫ বছর ধরে সুদামবাবু এই দোকান চালাচ্ছেন। গত ২৭ জুন সেই দোকানের পাশে নতুন দোকানঘর তুলতে শুরু করে জাহাঙ্গীর ফকির নামে এক ব্যক্তি। এতে অবশ্য সুদামবাবু কোনও আপত্তি করেননি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সুদামবাবু দেখতে পান তাঁর দখলে থাকা জমিতেও ঘর তুলতে শুরু করেছে জাহাঙ্গীর। এমনকি তাঁর চায়ের দোকানের জল যাওয়ার রাস্তাও রাখা হয়নি। তখন সুদামবাবু আপত্তি জানান। দোকানের জল যাওয়ার জন্য কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সেই অনুরোধ না শুনে সুদামবাবুকে মারধর শুরু করে জাহাঙ্গীরের পরিবারের লোকজন, সঙ্গে চলে ব্যাপক গালিগালাজ। সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন হিন্দু সংহতির কর্মী সমীর বৈদ্য। তিনি মারধরের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাকেও মারধর করে জাহাঙ্গীরের ভাই ময়না। খবর পেয়ে ছুটে আসেন সুদামবাবুর স্ত্রী স্বপ্না দেবনাথ। এবার তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাঙ্গীরের পরিবারের মেয়েরা। তাঁকে রাস্তায় ফেলে ব্যাপক মারধর করে। ইতিমধ্যে সংহতি কর্মী সমীর বৈদ্যও লোকজনকে খবর দেন। তাঁর ডাকে জড়ো হয় বেশ কিছু সংহতি কর্মী। এবার কিছু সময়ের জন্য পিছু হঠে জাহাঙ্গীররা। কিন্তু জাহাঙ্গীর ফোন করে তার সম্প্রদায়ের লোকজনকে ডাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ’দুয়েক মুসলমান সেখানে হাজির হয়ে যায়। দূরের মুসলমানরা মোটরভ্যান ভাড়া করে সেখানে পৌঁছায়। এসেই তারা হিন্দু সংহতির কর্মীদের ওপর চড়াও হয়। সংহতির কর্মীরাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়নগর থানার পুলিশ। উভয় পক্ষের তিন জন করে ছয় জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মারধরে গুরুতর আহত স্বপ্না দেবনাথকে প্রথমে নিমপীঠ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। স্বপ্নাদেবীর মাথায় এবং বুকে চোট লেগেছে।

এই ঘটনায় হিন্দু সংহতির পাঁচজন এবং জাহাঙ্গীরের দলবলের তিনজনের বিরুদ্ধে সুয়োমটো কেস দায়ের করেছে পুলিশ। এছাড়া সুদামবাবুও চারজন মুসলিম এবং দুশ জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যাক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন। মুসলিমরাও হিন্দুদের ১৪ জনের নামে এফআইআর করেছে।

সংহতি সভাপতিকে ‘সাভারকর সাহস পুরস্কার’

পুণে নগর হিন্দু মহাসভা এবং স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর স্মৃতি প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের বাসভবনে ‘লোকমান্য তিলক সভাগৃহে’ এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এবছরের ‘সাভারকর সাহস পুরস্কার’ তুলে দেওয়া হয় হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী তপন ঘোষের হাতে।

১৯১০ সালের ৮ই জুলাই ফ্রান্সের মার্সেইলস বন্দরে বীর সাভারকারের জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করে প্রতি বছর এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। এবছর ১১ই জুলাই এই অনুষ্ঠানে এই ‘সাভারকর সাহস পুরস্কার’ শ্রী ঘোষের হাতে তুলে দেন পুণের বিশিষ্ট সমাজসেবী গিরিশ প্রভুনে।

শ্রী ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘‘হিন্দু সমাজের মিথ্যা সত্বগুণের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে রজগুণের বন্যা বইয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, হিন্দুরা কাপুরুষ নয়। হিন্দুরা কখনো সামনা সামনি যুদ্ধে হারে না কিন্তু আমাদের নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে আমরা বার বার হয় লড়াইয়ের আগে অথবা পরে হার স্বীকার করে নিয়েছি। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর ‘তাসখন্দ চুক্তি’ ও ১৯৭১-এর যুদ্ধের পর ‘সিমলা চুক্তি’ এর স্পষ্ট উদাহরণ। তাই নেতৃত্বের পরিবর্তনই হিন্দু সমাজের বাঁচার একমাত্র উপায়।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা গান্ধীর মতো নেতা পেয়েছিলাম। আমরা যদি আমেরিকার আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো নেতা পেতাম তাহলে ভারত ভাগ হতো না এবং আমাদের ইতিহাস অন্যরকম হতো।’’ শ্রী ঘোষের বক্তব্য পুণেবাসী অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শোনেন এবং বিপুল করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করেন।

পুণে সফরে গিয়ে শ্রী ঘোষ ছত্রপতি শিবাজী ইতিহাস মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। ফ্রেঞ্চ সাংবাদিক ফ্রাঁসোয়া গতিয়ে এই মিউজিয়ামে ভারতের ইতিহাসকে সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। শ্রী ঘোষ পুণেবাসীকে এই মিউজিয়াম পরিদর্শন করার জন্য আহ্বান জানান।

মহারাষ্ট্রে মাদ্রাসা আর স্কুল নয়, শুধুই ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র

মহারাষ্ট্রে মুসলিম ধর্মশিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসাকে আর স্কুলের স্বীকৃতি দিতে রাজি নয় দেবেন্দ্র ফড়নবীশ পরিচালিত বিজেপি-শিবসেনা সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যেহেতু মাদ্রাসায় অঙ্ক, ইংরাজি, বিজ্ঞানের মতো সাধারণ বিষয় পড়ানো হয় না এবং সেখানে অন্য ধর্মের পড়ুয়ারা ভর্তি হতে পারে না, তাই মাদ্রাসাকে স্কুল হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

গত ২ রা জুলাই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মাদ্রাসায় পড়া ছাত্রদের এবার থেকে মহারাষ্ট্রে স্কুলছুট হিসাবে ধরা হবে। রাজ্যের সংখ্যালঘু দফতরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ কাম্বলে জানিয়েছেন, মাদ্রাসাগুলি যেহেতু কোনও সাধারণ পাঠক্রমে শিক্ষা দেয় না, তাই এরা প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে। মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, ‘আমরা চাই এই শিশুরা প্রথাগত শিক্ষা পাক, তাদের মূল ধারায় নিয়ে আসাটা আবশ্যক। বর্তমানে মাদ্রাসায় কত ছাত্র পড়াশোনা করছে তা সুমারির মাধ্যমে জানার পর তাদের কী ভাবে মুল স্রোতে ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হবে।’ পাশাপাশি তিনি একথাও জানিয়ে দিয়েছেন, ‘তবে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য মুসলিমদের জোর করা হবে না’। মহারাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী একনাথ খাড়সে জানিয়েছেন, ‘সংবিধানে প্রতিটি শিশুর প্রথাগত শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। এই অবস্থায় কেন তাদের ইংরাজি, অংক এবং বিজ্ঞানের মত প্রথাগত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে না? এখানে অন্য ধর্মের কেউই পড়তে পারে না। একজন হিন্দু বা খ্রিষ্টান শিশু মাদ্রাসায় পড়তে চাইলে তাকে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয় না। তাই এগুলি স্কুল নয়, শুধুই ধর্মশিক্ষা কেন্দ্র।’

মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণকারী পড়ুয়াদের ‘স্কুলশিক্ষা বিহীন পড়ুয়া’ বলে চিহ্নিত করতে সরকারী ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে ৪ঠা জুলাইয়ের পর থেকে রাজ্যের ১৮৮৯ টি মাদ্রাসার স্কুলের তকমা বাতিল হয়ে গেছে। এর ফলে ‘স্কুলশিক্ষা বিহীন’ হয়ে গেছে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার মাদ্রাসা পড়ুয়া। খড়সে জানিয়েছেন, এবিষয়ে তাঁর দফতরের বক্তব্য জানিয়ে সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের প্রধান সচিব জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় চিঠি লিখেছেন, স্কুল ও ক্রীড়া দফতরের প্রধান সচিব নন্দকুমারকে। চিঠিতে মাদ্রাসার পড়ুয়াদের স্কুল শিক্ষাবিহীন বলেই চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে শুক্রবারের নামাজের সময় মুসলিম সমাজের কাছে এই মর্মে আবেদন করুন।’ একনাথ খাড়সে জানিয়েছেন, ‘৫৫০টি মাদ্রাসা ইংরাজি, অংক এবং বিজ্ঞানের মতো প্রথাগত বিষয়ে শিক্ষা দিতে রাজি। এই সব মাদ্রাসাগুলিকে মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।’

সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিরোধিতাও শুরু হয়েছে। কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় নিরুপম বলেছেন, ‘কোনও শিশুকে ধর্মের নিরিখে বিচার করা ঠিক নয়। এটা স্কুল পড়ুয়া বাছতে গিয়ে বিভাজনের রাজনীতি করা হচ্ছে।’ মাদ্রাসা দারুল উলুম মহম্মদিয়াম সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মৌলানা আতর আলির দাবি, ‘মাদ্রাসাগুলি আধুনিক শিক্ষা দেয় না বটে, তবে শিক্ষা তো দেয়। সরকার তো নিজেই বহু মাদ্রাসাকে অনুদান দেয়, তারা কী করে মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে?’ জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দের সভাপতি মৌলানা মেহমুদ মাদানি বলেন, ‘যা ঘটেছে তা গ্রহণযোগ্য নয়।’

বহু প্রতিকূল অবস্থা পেরিয়ে আজও মা কালীর পূজা ফুরফুরা শরিফে

হুগলী জেলার ফুরফুরা শরিফ, যা পূর্বে বালিয়া বাসন্তির বাগদী রাজার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ শক্তির আরাধনা করে আসছে। গত ১৬ জুন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ মঙ্গলবার জাঙ্গিপাড়া থানার ফুরফুরা এবং গোপালনগর গ্রামের মানুষ প্রায় ২০০ বছরের মা রক্ষাকালীর পূজা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পালন করল। আশপাশের অঞ্চল থেকে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ দেবীমায়ের শক্তির আরাধনায় সামিল হন। পূজা উপলক্ষে ৩৫০টির বেশি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

এই পুজো করতে গিয়ে এলাকার হিন্দুদের বিভিন্ন সময়ে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ২০০৫ সালের একটি ঘটনা—বাংলায় তখন বামপন্থীদের রাজত্ব। তারা বিভিন্ন ভাবে এই পূজা বন্ধ করে দিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু সেই সময় এই পূজার পরিচালক ছিলেন স্বর্গতঃ লালমোহন মণ্ডল। এলাকায় মাস্টারমশাই নামে পরিচিত ছিলেন। কমিউনিস্টদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে পূজা চালিয়ে যান। এর জন্য তাঁকে প্রশাসনের কোপে পড়ে জেলেও যেতে হয়। কিন্তু এত করেও লালমোহনবাবুকে দমানো যায়নি। এলাকার মানুষদের সংগঠিত করে তিনি প্রতি বছর পূজা চালিয়ে যান। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি রক্ষাকালী মায়ের পূজা, মন্দিরের উন্নয়ন ও বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বর্তমানে ‘ধাড়া মায়ে’র পূজা হিসাবে পরিচিত এলাকার ধাড়ারা (বাগদী রাজার বংশধর) ও হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থকরা পূজাটি পরিচালনা করেন।

ভিন্ন দৃষ্টিতে ‘বঙ্গবন্ধু’র মূল্যায়ন

পবিত্র রায়

মুজিবুর রহমান ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। কিছুকাল পূর্বে গত শতাব্দীর সেরা বাঙালি বাছার জন্য একটি সংস্থা কাজ করছিল। যতদূর জানি সেরা বাঙালি প্রতিযোগিতায় মুজিবুর রহমানেরও নাম উঠছিল। প্রশ্ন হয় ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি নিয়ে। কে, কখন এবং কেন ও কোন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান করেছিল সেটা বিচার্য নয়। বিচার্য হওয়া উচিত শেখ মুজিব সত্যিই কি বঙ্গবন্ধু, মনে রাখা দরকার বঙ্গ বলতে শুধু বাংলাদেশ বা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়। এই দুটি অংশ হল পুরো বঙ্গপ্রদেশের খন্ডিত দুটি অংশ। আর মুজিবুর রহমান খন্ডিত ও অখন্ডিত, দুই প্রকার বংলাতেই বসবাস করেছেন, রাজনীতি করেছেন। আর রজনীতি ও জীবন শেষ হয়েছে চরম এক দুঃখজনক অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে, যা হল সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান ও সপরিবারে মুজিবকে হত্যাকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। দুই কন্যা হাসিনা ও রেহানা দেশের বাইরে থাকার জন্য বেঁচে যায়।

অখন্ড ভারত তথা বাংলায় মুজিবুর রহমান পড়াশোনার জন্য কলকাতায় আগমন করেন। পড়াশোনার জীবনেই ছাত্ররাজনীতির সূত্রে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তখনকার মুসলিম সমাজের এক গোঁড়া হিন্দু বিদ্বেষী নেতা যার নাম হুসেন সাহিদ সুরাবর্দী, তাকে মুজিবুর রাজনৈতিক গুরু হিসাবে মেনে নেন। সুরাবর্দীর জীবনে প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দু খুন করে দাঙ্গা বাধানো ও পাকিস্তান কায়েম করা। ফল স্বরূপ আগে হতেই তার প্রস্তুতি শুরু করেছিল সুরাবর্দী। যুবক মুজিবুর সেই কর্মকাণ্ডের একজন সহযোগী ছিলেন। অনেকের মত মুজিবুরও যে কোন মূল্যে পাকিস্তান কায়েমের স্বপ্ন দেখতেন। দাঙ্গার দিন অর্থাৎ ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬, মুজিবুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একা গিয়েপাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে এসেছিলেন। প্রথম দু’দিন চরম বর্বরতার সাথে হিন্দু নিধন কার্যের সময় মুজিবুরের কোনও প্রতিবাদ বা উপস্থিতি দর্শিত হয় না। যখন হিন্দুরা মার দেওয়া শুরু করল তখনই মুজিবুর-এর মন কেঁদে উঠল। সুরাবর্দী ও মুজিবুরের যুগলবন্দী রাস্তায় নেমে পড়ল। মুসলমান বন্ধু মুজিবুরের প্রথম মানসিক পরিচিতির পরিচয় আমরা উক্ত ঘটনায় দেখতে পাই।

মুজিবুরের অবিসংবাদী নেতা হওয়ার প্রথম এবং শেষ ধাপই হল বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন, জেল গমন, স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও মুক্তি পাওয়ার মাধ্যমে। অথচ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এবং তারও পূর্বে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে করাচিতে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা শুধু উর্দু হবে, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুজিবুর রহমানের কোনও সদর্থক ভূমিকা দেখা যায় না। সংসদের ওই অধিবেশনে পাকিস্তান কংগ্রেসের সংসদ সদস্য হিসেবে ধীরেন্দ্র নাথ দত্তই প্রথম প্রতিবাদ করেন। বলেন, পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষই বাংলা ভাষায় কথা বলেন। সুতরাং উর্দুর সাথে বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে রাখতে হবে। লিয়াকত আলি খান বলেছিলেন, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে হিন্দুস্থানের ১০ কোটি মুসলমানের জন্য। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ আনার জন্য ধীরেনবাবু বাংলা ভাষার প্রস্তাব করছেন। ভাষা এবং জাতিকে সমার্থক করে দিলেন লিয়াকত আলি। ধীরেন্দ্রনাথ বাবু বক্তৃতা শেষ করার পরই বলতে ওঠেন প্রেমহরি বর্মা। আরও দু’জন সহযোগী ছিলেনভূপেন্দ্র নাথ দত্ত ও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লক্ষণীয়, ভাষার দাবীতে চারজন হিন্দু নেতাকেই শুধু প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। পূর্ব বাংলা হতে পাঠানো সাংসদ তমিজুদ্দিন, খাজা নাজিমুদ্দিন ও লিয়াকত আলি খান বাংলা ভাষার বিপক্ষে বলেছিলেন। আর ১৯৪৮ এর সূত্র ধরে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকা বানিয়ে দেয়। অথচ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনে কখনও এই চারজন হিন্দু নেতার নাম মুখে উচ্চারণ করেছেন বলে জানা যায় না।

১৯৭১ সালের আন্দোলনে প্রথম দিকে মুজিবুরের স্বাধীনতার পক্ষে কোনও সায় ছিল না। ১৯৭০ সালের গণভোটে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৯০ শতাংশ আসন নৌকা প্রতীকে মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ দখল করে। ফলত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার নীতিগত দাবীদার হলেন মুজিবুর রহমান। প্রধানত জুলফিকর আলি ভূট্টোর প্রচেষ্টা এবং একগুঁয়েমিতে পশ্চিম পাকিস্তান এর প্রশাসক মহল সেটা মানল না। মুজিবুর রহমান চৌদ্দদফা দাবি পেশ করলেন। সেটাও মানা হল না। দু’পক্ষই এমন এক অনড় অবস্থানে পৌঁছাল যে আর ফেরার পথ রইল না। সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। মুজিবুর সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে গমন করলেন। রেখে গেলেন উত্তরসুরি হিসাবে তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল, কামরুজ্জামান, তাহের আলি ঠাকুর, মনসুর আলি প্রভৃতিকে, যারা পরবর্তী কালে জাতীয় নেতার মর্যাদা পেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এঁরা সত্যিকারের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম ছিলেন এবং ফলস্বরূপ আন্দোলন গতিপ্রাপ্ত হয়। এই নেতারা কাফের ভারতের সাথে উপযুক্ত দৌত্য না করলে বঙ্গবন্ধুর সশস্ত্র আন্দোলন কোনদিন স্বাধীনতার রূপ পেত না। সোজা কথায় ভারতীয় সেনা আত্মত্যাগ স্বীকার না করলে মুজিবুরের স্বাধীন বাংলাদেশ দেখার স্বপ্ন কোনও দিনই সফল হত না, বিশেষত যেখানে আমেরিকা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। প্রসঙ্গতঃ ১৯৭১ সালে বাঙালিদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের মাটিতে ৩৬৩০ জন ভারতীয় সেনা শহীদ, ৯৮৫৬ জন জখম ও ২১৩ জন নিখোঁজ হন। ভারতীয় বাহিনীর হাতে প্রায় চুরানব্বই হাজার পাক সৈন্য বন্দী হয়। এই বন্দী সৈন্য ছাড়ানোর তাগিদে মুজিবুরকে মুক্তি দান ও সিমলা চুক্তি করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। এই কলকাতাতেই ১৯৭২ সালে ইতিহাস সৃষ্টিকারী সংবর্ধনা দেওয়া হয় মুজিবুর রহমানকে।

বাংলাদেশে ফিরে মুজিবুরের প্রথম প্রতিক্রিয়াই ছিল ‘ভারতের সমস্ত সৈন্যকে এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হবে’ উবাচ প্রদানের মাধ্যমে ভারতে সাথে শত্রুতামূলক ব্যবহার করা। তার পরেই বলে বসলেন,‘আমার সাড়ে সাত কোটি মুসলমান ভাই।’ যেথায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের সবাইকে মুসলমান বলা হল বা অন্য ধর্মের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হল। পদে পদে ভারতীয় কূটনীতিক ও দূতাবাস কর্মীদের হেনস্থা করা হতে থাকল। পুনর্গঠনের কাজ করতে যাওয়া ভারতীয় প্রকৌশলীদের মারধর করা হল। মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন, সমস্ত স্বাধীনতা বিরোধী কাজ করা মানুষদের নিঃশর্ত ক্ষমা করা হল। সমসাময়িক সময়ে মুজিবুর উমরাহ পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পর পর উক্ত সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে মুজিবুরের ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়ে গেল।

তাজউদ্দিন আহমেদ নিঃশর্ত ক্ষমা, ভারতীয়দের বিপক্ষে চলা, ওই সময়েই উমরাহ পালন প্রভৃতির ভবিষ্যত বুঝতেন। তাই প্রথম থেকেই এগুলির বিরোধিতা করে মুজিবুরের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। সৌদি আরবের মাধ্যমে আবার পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হল। দেশ বিরোধী পাকিস্তানী শক্তি দেশের মধ্যে আবার অক্সিজেন পেল। হিন্দুরা মুজিবুরের মৃত্যুর পূর্বেই

শেষাংশ ৮ পাতায়

পড়া-খেলা ফেলে মাথা কাটা শিখছে বাচ্চারা ঃ বিষণ্ণ শৈশব

বাচ্চাদের হাতে বই নয়, খেলার সরঞ্জাম নয়, তুলে দেওয়া হচ্ছে ধারালো অস্ত্র। আর তাদের হুকুম দেওয়া হচ্ছে মাথা কেটে ফেলার। হুকুমকারীর অত্যাচারের ভয়ে খুদেরা মাথা কাটতে উদ্যত হচ্ছে। ইসলামিক স্টেট বা আই এস-এর এই নৃশংস আচরণের খবর সোস্যাল নিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে সারা বিশ্বে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। শৈশবের সঙ্গে এতবড় বঞ্চনা ইতিপূর্বে কোথাও ঘটেছে বলে স্মরণ করা যায়নি।

সিরিয়া ও ইরাকের শিশুদের কাছে এখন এটাই কঠোর বাস্তব। আই এস জঙ্গিরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাত থেকে খেলনা কেড়ে বন্দুক ধরিয়ে দিচ্ছে। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে মাথা কাটার। নিজেদের নৃশংসতার নতুন নতুন পন্থা বার করছে তারা। পুতুলের মাথা কেটে হাত পাকানো তাতেই নতুন সংযোজন।

গত বছর উত্তর ইরাকের ইয়াজিদি শহর এবং আশপাশের গ্রামগুলি ধর্মের ফতোয়া জারি করে একপ্রকার গুঁড়িয়ে দিয়েছিল আই এস জঙ্গিরা। নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল পুরুষদের। মহিলা ও ছোট ছোট মেয়েদের বন্দি করে যৌনদাসী করে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়। তবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল নাবালাক-কিশোরদের। তাদেরকেই প্রশিক্ষণ শিবিরে নিয়ে আসে জঙ্গিরা। প্রথমে ওই শিশুদের জোর করে ধর্মান্তরকরণ করা হয়। তার পর আই এস জঙ্গি ঘাঁটিতে তাদের জেহাদি প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সেখানেই শেখানো হচ্ছে নিত্যনতুন নৃশংস আচরণের পদ্ধতি। ছুরি বা তলোয়ার দিয়ে মাথা কাটাটা প্রশিক্ষণের একটা অঙ্গ।

গত ২০ জুলাই এমনই এক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিশোরী আত্মঘাতী বোমা হয়ে হামলা চালালো তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্তবর্তী সুরুক শহরে। এতে প্রাণ হারায় ২৮ জন এবং আহত শতাধিক। তুরস্ক প্রশাসন জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। হামলাকারী যে আই এস জঙ্গি তা নিশ্চিত করেছেন সানলিউর্ফা প্রদেশের গভর্ণর ইজ্জেতিন কুচুক। এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে আই এস। এই হামলার নিন্দার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সারা বিশ্ব।

সোস্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিল সাধারণ ভারতবাসী

জঙ্গি হানায় রক্তাক্ত পাঞ্জাব

গত ২৭শে এপ্রিল সৈন্যবাহিনীর পোষাকে পাঞ্জাবের দীনানগরে ঢুকে পড়ল তিন জঙ্গি। একটি মারুতি গাড়ি ছিনতাই করে প্রথমে একটি বাসে ও তারপর দীনানগর থানা সংলগ্ন অঞ্চলে নির্বিচারে গুলি চালালো তারা। পাঞ্জাব পুলিশের একজন এস পি সহ ৮ জন নিহত হল। আহতের সংখ্যা অনেক।

২৭ তারিখ ভোর রাতে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা সীমান্ত পেরিয়ে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে ঢুকে পড়ে। এক মারুতি ভ্যানের আরোহীকে গুলি করে গাড়িটি হাইজ্যাক করে তারা। দীনানগরের দিকে যাওয়ার পথে একটি যাত্রী বোঝাই বাসে গুলি চালায় জঙ্গিরা। এতে এক ব্যক্তি নিহত, ৪ জন আহত হয়। এরপর তারা দীনানগর থানার কাছে এসে নির্বিচারে গুলি চালাতে চালাতে থানায় ঢোকে জঙ্গিরা। এখানেই এস.পি. সহ সাতজন নিহত হন। খবর পেয়ে পাঞ্জাব পুলিশ ও সোয়াট কমান্ডোরা এলাকাটি ঘিরে ফেলে। প্রায় ১২ ঘণ্টা গুলির লড়াই চলে জঙ্গিদের সঙ্গে। অবশেষে জঙ্গিদের খতম করতে সমর্থ হয় বিশেষ বাহিনী।

ঘটনা চলাকালীন ও তারপর রাজনৈতিক নেতাদের একে অপরের বিরুদ্ধে বক্তব্যে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। দেশের নিরাপত্তা যেখানে বিঘ্নিত সেখানে ঐক্যমত না হয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণে বিরক্ত জনগণ। সোস্যাল মিডিয়ায় তারা তাদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা মরীচিকার মতো। বারবার জঙ্গি হানায় ভারতের মাটি রক্তাক্ত হলেও রাজনৈতিক নেতাদের কেন টনক নড়ছে না। এবার অন্ততঃ আমাদের এগিয়ে গিয়ে জবাব দেবার সময় এসেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্তরকম কূটনৈতিক সম্পর্ক এমন কি খেলাধূলাও বয়কট করার পক্ষে সওয়াল উঠেছে। শত্রুকে চিনতে না পারার খেসারত বারবার ভারতকে দিতে হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ রাষ্ট্রনেতাদের কাছে এইভাবে তাদের বক্তব্যকে পৌঁছে দিতে চাইছে। এখন দেখার দেশের কর্ণধাররা সাধারণ মানুষের এই দাবিকে কতটা গুরুত্ব দেন।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

নির্বিকার বাংলাদেশী প্রশাসন

মোলবাদী সন্ত্রাসীদের লাগাতার অত্যাচারে ভারতে পালিয়ে আসছে বাংলাদেশী হিন্দুরা

দুই মেয়েকে নিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছল সংসার ছিল। দুই মেয়েই কলেজে পড়ত। একদিন ছোট মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর বাবার কাছে দুই লাখ টাকা চাইল এক সন্ত্রাসী। পর দিনই পুলিশের সাহায্যে ওই সন্ত্রাসীর ডেরা থেকেই পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধার করল। কিন্তু ওই সন্ত্রাসীকে পুলিশ গ্রেফতার করল না। ফলে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকা পরিবারটি একদিন দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে এল। ওই গৃহকর্তার ভাই-ই একথা জনিয়েছেন।

এই ঘটনা খুব বেশি দিনের পুরনো নয়, ২০১২ সালের। ঘটনাস্থল বাংলাদেশের বগুড়া শাজাহানপুর উপজেলার পালপাড়ার। বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের খুব কাছেই গ্রামটি। গ্রামে শতাধিক পাল পরিবারের বাস। প্রায় একযুগ ধরে সেখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে মোরশেদ আলম (৩৫) নামে এক মুসলিম সন্ত্রাসী এবং তার দলবল। তার বাড়ি পালপাড়ার পাশেই আড়িয়া রহিমাবাদ গ্রামে। মোরশেদের অত্যাচারে ভারতে চলে গেছে বেশ কয়েকটি পরিবার। প্রশাসনের কাছে দরবার করেও কোনও সুরাহা পাননি অত্যাচারিত হিন্দুরা। মোরশেদের ভয়ে পাড়ার পুরুষরা এখন দলবেঁধে রাতপাহারা দেন।

মোরশেদের বিরুদ্ধে হত্যা এবং চাঁদার জুলুমের অভিযোগে মামলাও করেছেন গ্রামবাসী। এছাড়া মাদক ব্যবসা, জবরদখল, হিন্দু নারীদের তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, বসতবাড়ি এবং পালপাড়ার মৃৎশিল্পীদের ওপর হামলা, প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে প্রায় একযুগ আগে ২০০৩ সাল থেকে সে হিন্দুদের ওপর চাঁদার জুলুম এবং সন্ত্রাসী কাজ শুরু করে। ২০১০ সালে আড়িয়াবাজারে এক চাল ব্যবসায়ীর একটি ঘর দখল করে সেখানে ক্ষমতাসীন দলের একটি শাখা সংগঠনের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়। এরপর শাসকদলের ছত্রছায়ায় শুরু করে মাদক ব্যবসা। পাশাপাশি হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের মাত্রাও বাড়তে থাকে। মাঝে মাঝেই পালপাড়ায় এক এক জনের বাড়িতে চড়াও হয়ে মোটা টাকা দাবি করে। চাহিদা মত টাকা দিতে না পারলে মারধর এবং বাড়ি-ঘর ভাঙচুর করে।

গত ২৭ এপ্রিল উৎপলচন্দ্র পালের বাড়ি চড়াও হয়ে মাটির তৈরি জিনিসপত্র ভাঙচুর করে মোরশেদ এবং তাঁর দলবল। উৎপলবাবু জানান,' মোরশেদ তাঁর কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদার দাবি করেছিল, তিনি ২০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। চাহিদা মত বাকি টাকা দিতে না পারায় মোরশেদ দলবল নিয়ে তাঁর বাড়িতে হামলা চালায়। অজয় কুমার পালেরও একই অভিজ্ঞতা। ওই ঘটনার দু'দিন পর ২৯ এপ্রিল রাতে তাঁর বাড়িতে হানা দেয় মোরশেদের লোকজন। তারা মোটা টাকা দাবি করে। কিন্তু চাহিদা মত টাকা দিতে না পারায় মাটির তৈরি জিনিসপত্র ভাঙচুর করে রেখে যায়। অজয় কুমার পালের স্ত্রী পার্বতী পাল বলেন, 'তিনডা ছেলে লিয়ে অভাবের সংসার। সারাদিন রোদে-ঘামে কষ্ট করে মাটির জিনিস বানাই। সোয়ামি ভারত করে লিয়ে তা বিক্রি করে। হাড়ভাঙা খাটুনির পর সেদিন রাতে ঘুমায়ে পরিচি। হঠাৎ মধ্যরাতে দরজাত টাক টাক শব্দ। কে কে বলে হামি চিৎকার দিয়ে উঠি। কয় হামি মোরশেদ, দরজা খোল। হামি কই এত রাতে দরজা খোলা যাবে না। মোরশেদ কয় চাঁদা যখন দিবা না, আঙ্গিনায় সব মাটির জিনিস ভাঙা ফেললাম।'

পাড়ার বাসিন্দা গোবিন্দ পাল বলেন, পর পর দুই রাতে হামলার পর ভয়ে-আতঙ্কে গ্রামের বাসিন্দারা জেলা সদরে গিয়ে জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেন। হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ২ মে শাজাহানপুর থানায় মোরশেদের নামে মামলাও করেন। কিন্তু মোরশেদের টিকিও ছুঁতে পারেনি পুলিশ। গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, এখনও আতঙ্কে রয়েছে গ্রামের হিন্দুরা। গ্রামটি বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের কাছে হলেও অনেকটাই দুর্গম। গ্রামের একদিকে করতোয়া নদী, অন্য দুই দিকে ঘন জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। এই গ্রামে যাতায়াতের একটিই মাত্র মেঠোপথ। সেই পথ ধরে পালপাড়ায় প্রবেশের মুখেই চোখে পড়ল একটি তালা বন্ধ ঘর। এটিই মোরশেদ বাহিনীর ডেরা বলে স্থানীয় লোকজন জানালেন। পাড়ায় ঢুকতেই দেখা গেল চারিদিকে ছিটিয়ে রয়েছে মাটির তৈরি জিনিসপত্র। গ্রাম জুড়ে সুনসান পরিবেশ। দেখা মিলল কয়েকজন যুবকের। তাঁদের চোখে-মুখে আতঙ্ক। দুর্গামন্দির চত্বরে মহিলাদের জটলা, সকলেরই চেখে-মুখে উৎকণ্ঠা। সাংবাদিক এসেছে শুনেই কেঁদে ফেললেন এক গৃহবধূ। বললেন, 'দাদা হামাকেরে ইজ্জত বাঁচান, সম্ভ্রম বাঁচান, এতগুলো মানুষের প্রাণ বাঁচান। ওই সন্ত্রাসীটাকে পুলিশ ধরছে না। রাতের বেলা থানা থেকে পুলিশ এসে দুয়েক ঘন্টার লোক দেখানো টহল দিচ্ছে।'

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অমরেশ চন্দ্র পাল জানালেন, এপাড়ায় ১২০টি পরিবারের বাস। অধিকাংশই গরিব। মাটির জিনিসপত্র ও প্রতিমা তৈরি করে কোনও রকমে জীবিকা নির্বাহ করেন। ২০০৩ সাল থেকে মোরশেদেরে লোকজন এপাড়ার কারিগরদের কাছে চাঁদার জুলুম শুরু করে। চাঁদা না দেওয়ায় ওই বৃদ্ধ শিক্ষককেও মারধর করে মোরশেদের লোকজন। বাসিন্দারা জানান,২০১২ সালে এক কলেজ ছাত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে আতঙ্ক আরও চেপে বসেছে। এরপর প্রদীপ পাল নামে এক ব্যক্তি দুই মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে চলে যান। তার কিছুদিন পর দেশ ছাড়েন শ্যামাপদ পাল এবং শ্যামা পাল। গত বছর ডাবলু পালের কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে মোরশেদ। সাত দিনের মধ্যে টাকা না পেলে তাঁর স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়। ওই হুমকির চার দিনের মাথায় স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে যান ডাবলু।

এই অবস্থায় এখন রাত জেগে পাহারা শুরু করেছেন গ্রামের পুরুষরা। চায়না পাল বলেন, ' মরদেরা সারাদিন খাটুনি করে বাড়িত ফিরে। রাতে ঘুম নাই। লাঠি হাতে দলবেঁধে পাহারা দিতে যায়। আর বৌ-ঝিগেরে কোনও রকমে দিন কেটে যায়। সন্ধ্যা নামলেই বাড়তে থাকে আতঙ্ক।'

এব্যাপারে শাজাহানপুর থানার ওসি আবদুল মান্নান বলেন, 'পালপাড়ায় আগে কী হয়েছে সেটা বলতে পারব না। তবে চাঁদাবাজির মামলা দায়েরের পর মোরশেদকে গ্রেফতারের সব ধরণের চেষ্টা চলছে। পালপাড়ার আতঙ্ক কাটাতে রাতে সেখানে পুলিশের টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

বাগেরহাটে বিএনপি নেতার অত্যাচারে পালাচ্ছে হিন্দুরা

বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার কাটাখালি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের অত্যাচারে অতিষ্ট এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়। বিএনপি সমর্থিত ওই চেয়ারম্যানের নাম শেখ শওকত হোসেন ওরফে শওকত চেয়ারম্যান। নির্যাতিত হিন্দুরা জানিয়েছেন, তোলাবাজি, হত্যার হুমকি, বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ, জমি দখল এবং মিথ্যা মামলার ভয় দেখিয়ে মানুষকে হয়রানি করা সহ বিভিন্ন অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত এই শওকত চেয়ারম্যান। তার অত্যাচরে বহু মানুষ গ্রামছাড়া। অনেক হিন্দু ভারতেও পালিয়ে এসেছে।

এই শওকত চেয়ারম্যান একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি বলে অভিযোগ। বারুইপাড়া, নিকারিপাড়া, কাটাখালি, কার্তিকদিয়া, কোধলা-সহ আশেপাশের গ্রামের হিন্দুরা শওকত চেয়ারম্যানের অত্যাচার-নির্যাতনে তটস্থ থাকে। তার অত্যাচারের কথা সাংবাদিকদের সামনে বলতেও ভয়। যাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে প্রাণ ভয়ে তারা এখন বাড়ি ছাড়া। এমনকি প্রাণ ভয়ে কেউ থানায়ও অভিযোগ করতে সাহস পাচ্ছে না। এর আগে দেশের ক্ষমতা যখন বিএনপির হাতে ছিল তখন শওকত চেয়ারম্যানের অত্যাচারে বহু হিন্দু ভারতে পালিয়ে এসেছে। বর্তমানে শেখ হাসিনা ক্ষমতায়, কিন্তু তা সত্বেও শওকত চেয়ারম্যানের অত্যাচার অব্যাহত।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বারুইপাড়া ইউনিয়নের এক হিন্দু বৃদ্ধা জানান, বিএনপি সরকারের আমলেতাঁর প্রায় ৫ বিঘা জমি দখল করে নেয় এই শওকত চেয়ারম্যান। এর আগে তাঁর জমির ধান কেটে নিয়ে গিয়েছিল চেয়ারম্যানের গুণ্ডাবাহিনী। তিনি বলেন, 'ভাবিছিলাম হাসিনা ক্ষমতায় এলি অন্তত নিরাপদে থাকতি পারবানে, জান-মাল নিয়ে বাঁচতি পারবানে, কিন্তু তার আর জো কোনে। শওকতের অত্যাচার থেকি রেহাই পালাম কোনে? কান্না জড়িত গলায় তিনি আরও বলেন, 'আমাদির কি কোনও আমলি শান্তি নাই? এত ক্ষ্যামতা শওকতে ক্যামনি পায়েছে, কোথ থেকি পায়েছে? ওই গ্রামের আর এক প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন করাই চেয়ারম্যানের কাজ। এখন তো ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ সরকার। তার পরও কিভাবে শওকত এমন অপকর্ম করে পার পেয়ে যাচ্ছে তা সকলের কাছেই রহস্যময়।

হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের কথা স্বীকার করেছেন নিকারিপাড়ার বাসিন্দা মহঃ হামিদুর হোসেন। তিনি জানিয়েছেন, বিএনপি আমলে তো বটেই বর্তমানে হানিা সরকারের আমলেও বেশ কিছু হিন্দু বাড়ি দখল করেছে শওকত চেয়ারম্যান। কেবল সংখ্যালঘু হিন্দুরাই নয়, তার হাত থেকে নিস্তার পায়নি আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী, সমর্থকরাও। কেবল আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার দায়ে তিনি তো বটেই অনেককে প্রাণ ভয়ে দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে থাকতে হয়েছে। এছাড়া পাশের গ্রাম কার্তিকদিয়ার অনেক হিন্দু পরিবার দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তোলাবাজি, হুমকি, জুলুম কাকে বলে তার জ্বলন্ত প্রমাণ শওকত চেয়ারম্যান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কাটাখালি বাজারের এক ব্যবসায়ী জানান, এখনও প্রতিদিন চাঁদার টাকা গুনতে হয় তাঁকে। তার ওপর বিনি পয়সায় দোকান থেকে এটা ওটা নিয়ে যাওয়া তো আছেই।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বাগেরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মহঃ তোজাম্মেল হক বলেন, মাত্র দুই মাস হল আমি এই থানায় এসেছি। তাই অভিযোগগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি বলতে পারব না। তাছাড়া চেয়ারম্যান শেখ শওকত হোসেনের বিরুদ্ধে থানায় কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। অভিযোগ করলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনও ছাড় দেওয়া হবে না।

গৃহবন্দি ৮০টি পরিবারের হিন্দু মেয়েরা

যশোরে হিন্দুদের ভারতে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি

বাংলাদেশের যশোরের কেশবপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নের (কেশবপুর) মধ্যকূল গ্রামের রাজবংশী পাড়ায় ৮০টি হিন্দু পরিবারের বাস। সদস্য সংখ্যা চারশ'রও বেশি। তাঁরা এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে। এমনকি তাঁদের ভারতে চলে যেতে হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

জেলে সম্প্রদায় অধ্যুষিত রাজবংশীপাড়ার পুরুষরা সকাল হলেই মাছ ধরতে বেরিয়ে যান। তার পর সেই মাছ বিক্রি করে বাড়ি ফেরেন মধ্যরাতে। দিনের বেলায় গ্রামটি পুরুষ শূন্য থাকায় মাঝে মাঝেই আশেপাশের মুসলিম যুবকরা এসে মেয়েদের উত্যক্ত করে। ওই যুবকদের অত্যাচারে যুবতী মেয়েদের বাইরে বেরোনো বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। এখন শুরু হয়েছে নতুন উপদ্রব। মাঝে মাঝেই এসে চাঁদার জুলুম করছে তারা। দিতে না পারলে হুমকি, অত্যাচার জুটছে। গত ১৩ জুন রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ এরকমই জুলুমের মুখে পড়েন উমা সরকার নামে এক বাসিন্দা। ১৫-২০ জন মুসলিম যুবক এসে গ্রিলে ধাক্কা দিতে থাকে। তারা জানতে চায় ওই মহিলার স্বামী প্রভাস সরকার আছেন কিনা। উমাদেবী জানান তার স্বামী মাছ বিক্রি করে ফেরেননি। তখন ওই যুবকরা ৫৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। জানিয়ে দেয় টাকা দিতে না পারলে তাঁদের ভারতে চলে যেতে হবে এবং এখানে থাকলে সবাইকে মেরে ফেলারও হুমকি দেয় তারা। সেই সময় পাড়ার অন্য লোকজন সেখানে চলে আসায়, দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। ওই দুষ্কৃতিদের ছয় জনকে চিনে ফেলেন তাঁরা। তারা হল মধ্যকুল গ্রামের রফিকুল ইসলাম, রুবেল হোসেন, মাছুম হোসেন, হারুণ মোল্লা, আবদুল্লাহ ও মণিরামপুর উপজেলার হাসাডাঙা গ্রামের নাজিম উদ্দিন।

শিখা রায়, পারুল বিশ্বাস, পূর্ণিমা সরকার, সুবর্ণা সরকার, রিনা বিশ্বাসরা বলেন, 'ওই যুবকরা প্রায়ই তাঁদের পাড়ায় এসে হম্বিতম্বি করে। স্কুল-কলেজ পড়ুয়া মেয়েদের উত্যক্ত করে। তাদের ভয়ে কেউ বাড়ির বাইরে বের হতে পারে না।' তাঁরা জানান, 'বাড়ির পুরুষরা মাছ বিক্রি ও মাছ ধরার কাজে ভোরে বাড়ি থেকে বের হন আর মধ্যরাতে বাড়ি ফেরেন। মহিলারা সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকেন, বিশেষ করে তরুণীরা সব থেকে বেশি ভয়ে থাকেন।' বিকাশ রায় জানান, 'স্কুলে যাওয়ার সময় আমাদের পাড়ার ছেলে-মেয়েদের রাস্তায় নানাভাবে নাজেহাল করা হয়। বিভিন্ন অজুহাতে তারা আমাদের সঙ্গে মারামারি করে।'

এই অবস্থায় নিরাপত্তার দাবিতে রাজবংশী পাড়ার সাধারণ মানুষেরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। তিনি সেই স্মারকলিপি গ্রহণ করেন ও আতঙ্কিত হিন্দুদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, 'আপনারা একত্রিত হয়ে থাকুন তা হলে বাইরের কেউ আপনাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি স্মারকলিপিটি থানায় পাঠিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ারও আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতিদের কাউকে ধরতে পারেনি পুলিশ। এমন অবস্থায় রাজবংশী পাড়ার মানুষেরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

হরিণঘাটায় হিন্দুদের প্রতিরোধে পিছু হঠল দুষ্কৃতিরা

এতদিন মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের কাছে শুধুই পিছু হঠেছে হিন্দুরা। বরাবরই তাদের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে হিন্দুদের। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে কিছুটা হলেও সেই চিত্র পাল্টাতে শুরু করেছে। বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু সংহতির কর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। হিন্দুদের সেই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে এবার পিছু হঠছে মুসলিমরা। নদীয়া জেলার হরিণঘাটায় দুটি ঘটনায় সেটাই করে দেখাল হিন্দু সংহতির নেতৃত্বে এলাকার মানুষ।

প্রথমটি হরিণঘাটা থানার রসুল্যাপুরের। এই এলাকার পাশ দিয়ে চলে গেছে চাকদহ-বনগাঁ রোড। এই রাস্তার পাশেই রয়েছে সমীর বিশ্বাসের চাষের জমি। রাস্তা এবং জমির মাঝে একটি নয়ানজুলি ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে মাটি পড়ে সেটি বুজে গিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর, রায়দিঘি, বারুইপুর-সহ বিভিন্ন জায়গায় যা ঘটছে এক্ষেত্রেও স্থানীয় মুসলমানরা তাই করে। গত ২ জুলাই এলাকার বেশ কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ সেই জমিটি ঘিরে দিয়ে দখল করে নেয়। সমীর বিশ্বাস আপত্তি করলেও তাতে আমল দেয়নি, বরং তাঁকে মারধর করা হয়। এরপর সমীর বিশ্বাসের পাশে দাঁড়ান স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মীরা। জমি দখলকারীদের ডেকে তাঁরা আলোচনায় বসেন। কিন্তু সেই আলোচনা ব্যর্থ হয়। এরপর দ্বিতীয় দফায়ও আলোচনায় বসেন সংহতির কর্মীরা। কিন্তু জমি দখল মুক্ত করার ক্ষেত্রে অনড় মনোভাবই দেখায় মুসলমান সম্প্রদায়। এই অবস্থায় আলোচনা মাঝপথেই ভেঙে যায়। ক্ষুব্ধ হিন্দুরা দখল করা জমির বেড়া ভেঙে দেয়। সেই সময় হিন্দু সংহতির এক কর্মীকে মারধর করা হয়। রুখে দাঁড়ান সংহতির কর্মীরা। প্রতিরোধের মুখে পড়ে ফোন করে আরও লোকজন ডেকে আনে মুসলিমরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই শখানেক লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হিন্দুরাও ততক্ষণে বেশ বড় সংখ্যায় জড়ো হয়ে গেছে। সংঘর্ষে দুই পক্ষের নয় জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে সাত জনই মুসলমান সম্প্রদায়ের। আহতদের সকলকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যে জমি নিয়ে বিরোধ সেই জমিটি বর্তমানে সমীর বিশ্বাসের দখলে। তিনি সেখানে ধানের চারা রোপন করেছেন।

দ্বিতীয় ঘটনা হরিণঘাটা বাজার থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরের নারায়ণপুর হিন্দু পাড়ার। ওই পাড়ায় গত এক বছর ধরে জমি কিনে বসবাস শুরু করেছেন নজরুল নামে এক ব্যক্তি। তার বাড়ির পাশেই বেশ কিছুটা ফাঁকা জমি পড়েছিল। সম্প্রতি নজরুল সেই জমি বেড়া দিয়ে ঘিরে নেয়। এলাকার হিন্দুরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন ওটা খাস জমি। এরপরই হিন্দুরা আপত্তি করে। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। এবার এগিয়ে আসেন স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মীরা। তাঁরা জমির বেড়া ভেঙে দেন। এতে ক্ষুব্ধ নজরুল ফোনে তার সম্প্রদায়ের লোকজনকে ডেকে পাঠায়। তার ডাকে জনাকুড়ি মুসলমান এগিয়ে আসে। কিন্তু হিন্দুদের প্রতিরোধে শেষ পর্যন্ত তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। সেই দিন রাতেই ওই জমিতে একটি পাকা শিবমন্দির তৈরি করে ফেলেন হিন্দুরা। বর্তমানে সেখানে প্রতিদিন পূজাপাট চলছে।

ঈদের ছুটি নিয়ে বচসার জেরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা

ঈদ উপলক্ষে তিনদিন ছুটির দাবীকে কেন্দ্র করে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বচসা থেকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পরল সালার থানার টিঁয়া-তে। পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে র‍্যাফ নামাতে বাধ্য হয়েছে জেলা পুলিশ। বেশ কয়েকটি পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের খবর পাওয়া গেছে। ২৪ জন হিন্দু গ্রেফতার, এলাকার পুরুষরা পুলিশী অত্যাচারে ঘরছাড়া, ১২টি হিন্দু পরিবার গ্রামছাড়া।

টিঁয়া শান্তিসুধা দাস উচ্চমাধ্যমিক স্কুল। প্রাপ্ত খবর, মুসলিম ছাত্ররা দাবী করে যে রমজান মাসে স্কুলের আট পিরিয়ড ক্লাস কমিয়ে ছয় পিরিয়ডে আনতে হবে, নামাজ পড়ার জন্য একটা আলাদা ঘর দিতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের দাবী মেনে নেয়। এর পরে তারা দাবী করে যে ঈদ উপলক্ষে তিন দিন ছুটি দিতে হবে। প্রধান শিক্ষক এই দাবী না মানায় স্কুলের মুসলিম ছাত্ররা তাদের লেখা মাস পিটিসনে সব ছাত্রকে দিয়ে সই করাতে শুরু করে। স্কুলের হিন্দু ছাত্ররা তাতে সই করতে সম্মত না হওয়ায় ঝামেলা শুরু হয়। গত ১৫ই জুলাই স্কুলের হিন্দু ছাত্রদের শায়েস্তা করার জন্য কয়েকজন মুসলিম ছাত্র অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্কুলে এলে মারামারি শুরু হয়। সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সালার থানায় ফোন করেন। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে হিন্দু ছাত্রদের অভিভাবকরা এবং এলাকার সাধারণ মানুষ স্কুলের বাইরে জমতে শুরু করে। থানা থেকে পুলিশ এসে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে উপস্থিত জনতার উপরে লাঠিচার্জ করতে শুরু করে। এতে ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে এবং কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এরপর বহরমপুর থেকে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। এরপর র‍্যাফ-এর বিশাল বাহিনী এসে জনতার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি ঢুকে শুরু হয় তাণ্ডব। তাদের হাত থেকে মহিলারাও রেহাই পায়নি বলে স্থানীয় মানুষের বক্তব্য। এখনও পর্যন্ত ২৪ জন হিন্দুকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পরবর্তী দিনে টিঁয়া স্টেশন চত্বরে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। প্রচুর পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে স্টেশন এলাকায়।

জমি বিবাদ ঃ দুষ্কৃতির মারে মা ও মেয়ে হাসপাতালে

জমি নিয়ে বিবাদের জেরে মা ও মেয়েকে বিবস্ত্র করে পেটালো গ্রামেরই কয়েকজন দুষ্কৃতি। গত ২৫ জুলাই,শনিবার দুপুরে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মুকুদপুর গ্রামের ঘটনা। গ্রামের বাসিন্দা সুজান ভকতের (৫১) আট বিঘা জমি রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার পরিতিক দুষ্কৃতি সারিফুল শেখ ও মুন্ন শেখ জমিটি দখলের চেষ্টায় রয়েছে। ২৫ তারিখ শনিবার, সুজান ভকত যখন জমিতে কাজ করছিল তখন সারিফুল ও মুন্ন তাদের দলবল নিয়ে জমি দখল করতে আসে। সুজান বাধা দিলে তাকে বেধড়ক মারতে শুরু করে দুষ্কৃতিরা। এই অবস্থায় তাঁকে বাঁচাতে তাঁর স্ত্রী বিমলা ভকত (৪৫) ও মেয়ে পাপিয়া ভকত (২০) চিৎকার শুনে ছুটে এলে দুষ্কৃতিরা তাদেরকেও শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে ও পরণের কাপড় ছিঁড়ে দেয়। নিগৃহীত দুই মহিলার চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে এলে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। আহত দুই মহিলা সহ তিনজনকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের পক্ষ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। জেলার পুলিশ সুপার প্রসূন ব্যানার্জী বলেন অভিযুক্তরা গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তাদেরকে খোঁজা হচ্ছে।

পঞ্চগ্রামে গৃহহারাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল হিন্দু সংহতি

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ডহারবার ব্লকের অন্তর্গত পঞ্চগ্রাম, গত ২৪শে জুন ৩০টি হিন্দু তফশিলি পরিবার জেহাদের আগুনে পুড়ে ঘরছাড়া হয়েছিল। তাদের সর্বস্ব লুঠ করে বাড়িগুলি সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছিল কয়েকশো মুসলমান দুষ্কৃতির দল। ঘটনার পর স্থানীয় বরপাড়া ও বাগানিপাড়া থেকে বেশকিছু হিন্দু পরিবার ইতিমধ্যে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছে। অনেক পরিবার তো আর পঞ্চগ্রামে ফিরতেই রাজি নয়। তাদের বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে আবার তাদের মুসলিম আক্রমণের সামনে পড়তে হবে। কুখ্যাত সেলিম যদি আবার এলাকায় ত্রাসের সঞ্চার করে তাহলে তাদের বাঁচার আর কোন আশা নেই, কারণ তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিষমদ কাণ্ডে ১৭৩ জন মৃত্যুর জন্য দায়ী ও সিআইডি-র হাতে ধৃত খোঁড়া বাদশা কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগণার অলিখিত সম্রাট সেলিম লস্করের প্রথম সারির শাকরেদ।

পঞ্চগ্রামের হিন্দুদের আত্মবিশ্বাস একদম তলানিতে এসে ঠেকেছে। তাদের আত্মবিশ্বাস কিছুটা

ফিরিয়ে আনার সংকল্প নিয়ে গত ২৬শে জুলাই হিন্দু সংহতি-র প্রতিনিধিরা বরপাড়ায় হাজির হয়েছিল। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ত্রাণ সামগ্রী।

হিন্দু সংহতির পক্ষে সুজিত মাইতি, সুন্দরগোপাল দাস, রাজকুমার সর্দার, টোটন ওঝা-সহ অন্যান্য কর্মীরা ত্রাণ নিয়ে সকাল সকাল পঞ্চগ্রামে পৌঁছায়। ১১০টি পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। প্রতিটি প্যাকেটে চাল, ডাল, চিনি, আলু, সর্ষের তেল ও একটি করে শাড়ি ছিল। কলকাতার সালাসার ভক্তবৃন্দ এই কার্যক্রমে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

৬ পাতার শেষাংশ

ভিন্ন দৃষ্টিতে 'বঙ্গবন্ধু'র মূল্যায়ন

আস্তে আস্তে দেশত্যাগ শুরু করল। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলেও যোগেন মণ্ডল বাংলাদেশে ফিরে যাননি। কারণ তিনি মুজিবুর এবং মুসলমান মানসিকতা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন।

অনেকেই বলে থাকেন বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে ভারত এবং বাংলাদেশের ভয়ানক ক্ষতি হয়ে গেছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ এর মধ্যে হিন্দু এবং হিন্দুস্থান বিরোধী যত কাজ মুজিবুর করে গেছেন, তাতে বেঁচে থাকলে ভারত এবং বাংলাদেশের হিন্দুদের কপালে অসীম দুঃখ ছিল। যে মানুষ মুসলিম প্রীতির জন্য তাদের সমস্ত জঘন্য অপরাধ নিঃশর্ত ক্ষমা করতে পারেন, অদ্যকার দিনে পাকিস্তানের মত মুসলিম জেহাদিদের সক্রিয় প্রশ্রয় দিয়ে তিনি বিশ্ব সন্ত্রাস কায়েম করতেন না, সেই নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। প্রসঙ্গত ভারত-পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার পর হতে, ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত পূর্ব পূর্ব পাকিস্তানে বারে বারে হিন্দু নিধন পর্বে মুজিবুরকে কখনও সদর্থক অসাম্প্রদায়িক ভূমিকায় দেখা যায়নি, বরং নীরব সমর্থনকারীর ভূমিকাতেই দেখা যায়। বাংলাদেশের অফুরন্ত ক্ষতি হয়েছে, তবে মুজিবুরের মত্যুতে নয়, হয়েছে তাজউদ্দিনের মৃত্যুতে তথা চার জাতীয় নেতার মৃত্যুতে। মুজিবুর যদি তাজউদ্দিনের কথা মানতেন তাহলে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের এই পরিণতি হত না।

সামগ্রিকভাবে মুজিবুর রহমানের জীবনী বিচার করলে তাঁকে একজন পূর্ণ সাম্প্রদায়িক মুসলিম বলার বাইরে কিছু বলা যায় না। মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মুসলিম বন্ধু হতে পারেন, দুই বাংলার মুসলমানেরও বন্ধু হতে পারেন, হিন্দুর বন্ধু কখনই হতে পারেন না। সেই সূত্রে পূর্ণ বঙ্গ প্রদেশের বন্ধু আপামর মানুষের 'বন্ধু' হিসেবে মুজিবুর স্বীকৃতি পেতে পারেন না। 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে তাইতো সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। বাংলাদেশীদের কাছে মুজিবুর নয়নের মণি হতে পারেন, 'বঙ্গবন্ধু' হতে পারেন বা আরও বড় কিছু হতে পারেন, কিন্তু কোনও ভারতীয় হিন্দুর কাছে তিনি কখনই বঙ্গবন্ধু নন। অবাক হতে হয় তখন, যখন দেখা যায় শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুগণ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' বলে মেনে নিয়ে সম্ভ্রম দেখাচ্ছে। সর্বাঙ্গীনভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মুজিবুর রহমানকে একজন বিশ্বাসঘাতক, চরম হিন্দুবিরোধী সাম্প্রদায়িক মুসলমানের বাইরে কোনও ভারতীয় হিন্দুর পক্ষে বলা সমীচিন নয়।

নাইজিরিয়ায় ইসলামী সন্ত্রাসের বলি ১৪৫

গত ২৬ জুন রমজান মাসের জুম্মাবারে মুসলিম জেহাদিদের সন্ত্রাসে তিনটি দেশে খুন হয়েছিল ৬৩ জন। সেই ঘটনার চার দিনের মাথায় ১ জুলাই বুধবার ফের নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালাল মুসলিম জেহাদিরা। এবার মুসলিম জঙ্গিদের লক্ষ্য ছিল নাইজিরিয়া। উত্তর-পূর্ব নাইজিরিয়ার দুটি গ্রামে হামলা চালিয়ে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধসহ ১৪০ জনকে খুন করেছে আলকায়দা ঘনিষ্ঠ জঙ্গি সংগঠন বোকো হারামের ঘাতক বাহিনী। এর মধ্যে বরনো প্রদেশের কুকাওয়া নামের একটি গ্রামেই ৯৭ জনকে খুন করা হয়েছে।

নাইজিরিয়ার উত্তর-পূর্বের বরনো অঞ্চলে গত দু'বছর ধরে ক্রমে শক্তি বাড়িয়েছে বোকো হারাম। এই জঙ্গিদের প্রথমে লক্ষ্য ছিল স্থানীয় খ্রিস্টান বাসিন্দা এবং তাঁদের ধর্মস্থানগুলি। কিন্তু হত্যার নেশায় মেতে উঠে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদেরও খুন করতে শুরু করে। বুধবার বিকেলে বরনো প্রদেশে কুকাওয়া গ্রামে প্রথম হানা দিয়েছিল ৫০ জঙ্গির একটি দল। গ্রামের মহিলারা তখন সাংসারিক কাজে ব্যস্ত। পুরুষ এবং বেশিরভাগ শিশুই মসজিদে নামাজ পড়তে গেছে। জঙ্গিদের একটি দল গ্রামের মহিলাদের খতম করার কাজ শুরু করে অন্য একটি দল বিভিন্ন মসজিদে হামলা চালায়। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, মসজিদে যারা হামলার জন্য চড়াও হয়েছিল তারা নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। তার পর শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সকলকেই মসজিদের মধ্যে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে গুলিবর্ষণ করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, হত্যালীলা চালানোর পর জঙ্গিরা মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করে। সংবাদসূত্রে জানা গেছে সাতটি গাড়ি এবং ন'টি মোটরবাইকে করে জঙ্গিরা হানা দিয়েছিল। ওই গ্রাম থেকে মাত্র ১১ কিলোমিটার দূরে কানওয়া অঞ্চলে এক হাজার সেনার একটি দল হাজির ছিল। জঙ্গিরা কয়েক ঘন্টা ধরে তাণ্ডব চালালেও গ্রামবাসীদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি সেনাবাহিনী। কুকাওয়া ছাড়া মুসারাম গ্রামেও হত্যাযজ্ঞ চালায় জঙ্গিরা। ওই গ্রামে ৪৮ জনকে গুলি করে হত্যা করে বোকো হারাম জঙ্গিরা।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686